অন্তরঙ্গ

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

অপর্ণা বুক ডিস্ট্রিবিউটার্স
(প্রকাশন বিভাগ)
কলিকাতা-৭০০০০৯

শ্রাবণী ও প্রণবকুমার মুখোপাধ্যায়কে

লেখকের কয়েকটা উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ

পূর্ব পশ্চিম ১/২
সেই সময় ১/২
একা এবং কয়েকজন
ধুলিবসন
অরণ্যের দিনরাত্রি
রাধা কৃষ্ণ
ভালোবাসা
নিজেকে দেখা
জীবন যে রকম
আত্মপ্রকাশ
অসমতল
ময়ূর পাহাড়
তালভঙ্গ
কোথায় আলো
চারজন এবং একজন
সুখের দিন ছিল
উড়ন চণ্ডী
কর্ণ
সুর সুন্দরী
রূপালী মানবী
দৃষ্টিকোণ
বাছাই গল্প
শ্রেষ্ঠ গল্প
স্বনির্বাচিত শ্রেষ্ঠ গল্প
স্বর্গের নীচে মানুষ
প্রতিদ্বন্দ্বী
প্রকাশ্য দিবালোকে
সমুদ্র তীরে
দর্পণে কার মুখ
বরণীয় মানুষ : স্মরণীয় বিচার
স্বপ্ন লজ্জাহীন
মেঘ বৃষ্টি রোদ
ব্যক্তিগত
বন্ধুবান্ধব
শকুন্তলা
দরজার আড়ালে
তিন চরিত্র
জীবন উৎসব
আকাশ মাটি অরণ্য
বসন্ত দিনের খেলা
সপ্ত কন্যার কাহিনী
সুপ্ত বাসনা

এক

আমার মেজোকাকার ছেলের বিয়ে, নেমন্তন্ন বাড়ীতে সে কি কেলেঙ্কারী কাণ্ড।

মেজোকাকা টালিগঞ্জে নতুন বাড়ী তৈরী করেছেন এবং তাঁর বড় ছেলের বিয়ে, সুতরাং বেশ ধূমধামের ব্যাপার। দিল্লী আর পাটনা আর গৌহাটি থেকে পর্যন্ত আত্মীয়-স্বজনরা এসেছেন, গম্‌গম্‌ করছে সারা বাড়ি, আমি কোমরে তোয়ালে জড়িয়ে অকারণে ব্যস্ত হয়ে খুব কাজ দেখাচ্ছি। গৌহাটির পিসেমশাই চা-বাগানের ম্যানেজার—মানুষকে হুকুম করা তাঁর অভ্যেস—সুতরাং যখন তখন ভরাট গলায় যাকে-তাকে হুকুম করে কর্তৃত্ব দেখাচ্ছেন, মেয়েরা শাড়ি-গয়নার আলোচনায় মুখের ফেনা তুলে ফেলেছে, মেজোকাকা মাংসওয়ালাকে খুব কচি নয়, অথচ চর্বি থাকবে না—এমন পাঁঠার কথা বোঝাচ্ছেন, কুটুমবাড়ির দেওয়া জিনিসপত্রের মাঝখানে মেজোকাকিমা নৈবেদ্যর ওপরে কিসমিসটির মতন বসে আছেন, এই সময় কাণ্ডটা ঘটলো।

ছাদে দৈ-মিষ্টি তৈরী হচ্ছে—আমি তার তদারকি করছিলুম, বিকু এসে চুপি চুপি আমাকে বললো, নীলুদা, তুমি ছাড়া আর কেউ পারবে না, তাই তোমাকেই বলতে এলুম, তুমি যদি একটু চেষ্টা করো, মানে ইয়ে···। আমি হাসতে হাসতে বললুম, লজ্জা কি বাবাজীবন, বলেই ফেল! কিন্তু আজ তো দেখা হবে না, আজ কালরাত্রি! বিকু বললো, না না, তা নয়, ওর শরীরটা ভালো নেই—

আমি সরলভাবে জিজ্ঞেস করলুম, ওর মানে কার?

বিকু বললো, ঐ যে, তোমার ইয়ের, মানে শরীরটা ভালো নেই, তাই বলছিলুম কি, মেয়েরা যদি আচার-টাচার খানিকটা কমিয়ে একটু তাড়াতাড়ি শুইয়ে দেয় ওকে—

এরপর বিকুর সঙ্গে খানিকটা ঠাট্টা ইয়ারকি করে আমি ওর অনুরোধ ঠেলতে না পেরে নিচে নেমে এলুম: যদি হিংস্র কৌতূহলী মেয়েদের সরিয়ে নতুন বউয়ের একটু বিশ্রামের ব্যবস্থা করা যায়। ভাগ্যিস এসেছিলুম, তাই আমি সেই কাণ্ডটার সাক্ষী হতে পারলুম।

উৎসব বাড়ি সরগরম করে রেখেছিল আর একজন, বড় কাকার মেয়ে কাজলদির ছেলে রিণ্টু। বয়স মাত্র চার বছর, কিন্তু সে একাই একশো জনের সমান। ফুটফুটে ফর্সা রং, কোঁকড়া চুল, দেবশিশুর মতন কান্তি, কিন্তু আসলে একটি এক নম্বরের বিচ্ছু। কখনো সে ছাদে, কখনো সে একতলায়, কখনো রান্না ঘরে—সব জায়গায় রিণ্টু, জরুরি সমস্ত কথাবার্তার মধ্যে রিণ্টু এসে গণ্ডগোল উৎপাত শুরু করবে। সব উৎসব বাড়িতেই বোধহয় ঐ রকমের এক একটি বিচ্ছু থাকে। কিন্তু রিণ্টুকে বকুনি দেবার উপায় নেই—বড় কাকার সে আদরের নাতি—ওকে শুধু ধমকালেই কাজলদির মুখ লাল।

ছাদ থেকে নেমে এসে আমি নতুন বউ যে ঘরে বসে আছে সেইদিকে যাচ্ছিলুম, রিণ্টু আমার জামা টেনে ধরে জিজ্ঞেস করল, নীলুমামা ঐ ঘরে ঐ বস্তাটায় কি আছে? সারাদিন ধরে রিণ্টুর মুখে ওটা কি, ওটা কেন, ওটা কোথায়—এতবার শুনতে হয় যে আর ধৈর্য থাকে না—সুতরাং আমি উত্তর না দিয়েই এগিয়ে যাচ্ছিলুম, রিণ্টু তবু আমার পিছন পিছন আসতে আসতে বলল, বলো না, ঐ বস্তাটায় কি আছে, বলো না? সিঁড়ির পাশে ভাঁড়ার ঘরে অনেক কিছু কিনে রাখা হয়েছে—রিণ্টু তারই একটা বস্তা দেখিয়ে বার বার বলছে, বলো না, ওটায় কি আছে! বলো না! বাধ্য হয়েই সেই বস্তাটার দিকে এক পলক তাকিয়ে আমি রাগতভাবে উত্তর দিলুম ওটায় চিনি রাখা আছে। যাও এবার খেলতে যাও!

রিণ্টু আমার জামা ছেড়ে দিল, তারপর বেশ অভিমানী সুরে বললো, আমি ওটার ওপরে হিসি করে দিয়েছি।

—অ্যাঁ???

আমিও ঘুরে দাঁড়িয়েছি, মেজোকাকাও পাশ থেকে কথাটা শুনে-ছেন, দু'জনে সমস্বরে জিজ্ঞেস করলুম, অ্যাঁ? কি বললি, রিণ্টু?

রিণ্টু বেশ সহজভাবেই সবাইকে শুনিয়ে বললো, আমি ঐ চিনির বস্তার ওপরে হিসি করে দিয়েছি। মাকে ডাকলুম, মা যে আসছিল না—

যেন একটা বোমা পড়েছে, একমহূর্তের জন্য সব চুপ। নতুন বউয়ের গয়নার ডিজাইন লক্ষ্য করছিলেন কাজলদি, তিনি যেন ভূত দেখার মতন দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন রিণ্টুর দিকে। সন্দেহ কি রিণ্টুর জাঙ্গিয়া তখনও ভিজে, আমরা কয়েকজন ভাঁড়ার ঘরে ছুটে গেলুম, চিনির বস্তাটা ভিজে জবজব করছে—অনেকক্ষণ চেপে রেখেছিল তো রিণ্টু, তাই বেশ অনেকখানি—

ব্ল্যাকমার্কেট থেকে সাড়ে চার টাকা দরে কেনা ৫০ কিলো চিনি। মেজোকাকার মুখখানা গুড়ের মতন চট্‌চটে হয়ে এলো, তিনি ধপ করে বসে পড়ে বললেন, একি সব্বনেশে ব্যাপার, এখন পাওয়া যাবে কিনা আর এতগুলো টাকা —ওফ্! মেজোকাকিমাও ছুটে এসেছিলেন, তিনি বুদ্ধিমতী, তিনি তাড়াতাড়ি বললে, চেঁচিয়ে বাড়িশুদ্ধ লোককে শোনাচ্ছো কেন? চুপ করো না, কি হয়েছে কি?

পঞ্চাশ কিলো চিনির দাম দুশো পঁচিশ টাকা। প্রথম সমস্যা, এক্ষুনি অতটা চিনি আবার জোগাড় করা যাবে কিনা। তা ছাড়া অতগুলো টাকা বাজে খরচ। মেজোকাকা অসহায়ের মতন আমার হাত চেপে ধরে বললেন, এখন কি করি বলতো নীলু—ওফ্—

মেজোকাকিমা বললেন, চুপ করো, সারা বাড়ি চেঁচিয়ে শোনাচ্ছো কেন?

আমি মেজোকাকিমার মনের ভাব বুঝতে পেরে বললুম, হ্যাঁ, মানে, ছোটছেলের ইয়ে তো খুব পাতলা হয় একটু বাদে উপে যাবে—কেউ টের পাবে না।

পিছন থেকে কে যেন বললো, হ্যাঁ, রিণ্টু বলেছে বলেই তো

আমরা জানতে পারলুম, যদি না বলতো, কেউ হয়তো টেরও পেতুম না।

মেজোকাকা বলে উঠলেন,—না, না, না এখন লোকজন জানবেই—শেষে এত আয়োজনের পর ঐ সামান্য ব্যাপারের জন্য বদনাম হবে—

দুম দুম করে পা ফেলে কাজলদি ঘরে ঢুকে বললেন, কোথায় গেল সে হতভাগা ছেলে? আমি আগেই বলেছিলুম, ও ছেলে নিয়ে আমি,···সন্ধেবেলা এসে শুধু নেমন্তন্ন খেয়ে গেলেই হতো, তা না—

মেজোকাকা বললেন, না, না, কাজল, তুই ওকে কিছু বলিসনা, ও অবোধ শিশু—

কাজলদি বললেন, শোনো কাকা, চিনির দামটা আমি দিয়ে দেবো, তুমি আবার আনিয়ে নাও।

—সে কি কথা, তুই দাম দিবি কি! ছিঃ! সামান্য টাকা—

—মোটেই সামান্য নয়। ঐ টাকার জন্যে আমি কারুর কথা শুনতে পারবো না। আমার ছেলে পাজী, আমার ছেলে খারাপ, আমি শিক্ষা দিতে জানি না—

কাজলদি অবস্থাটা আরও ঘোরালো করে ফেললেন। হঠাৎ ঝরঝর করে কেঁদে ফেলেন! তারপর রাগারাগি কান্নাকাটি আরও বাড়তে লাগলো, আমি সেখান থেকে কেটে পড়লুম। ছাদে উঠে দেখি—ঠাকুররাও এখবর জেনে গেছে, তারা উনুনের সামনে বসে মুখ টিপে হাসাহাসি করছে। এত তাড়াতাড়ি কি করে খবর ছড়ায় কে জানে! আর, ছাদের কোণে তিন চারটে বাচ্চার সঙ্গে প্রবল বিক্রম খেলায় মেতে আছে রিণ্টু। তার কোনো গ্লানি নেই। হঠাৎ আমার হাসি পেল।

জর্জ ওয়াশিংটনের গল্প শুনেছিলুম, বাগানের ফুলগাছ কেটে ফেলে বাবার কাছে সেই কথা স্বীকার করেছিলেন ছেলেবেলায়, তাঁর বাবা ফুলগাছের দুঃখ থেকেও ছেলের সাহস ও সত্যবাদিতায় বেশী খুশী

হয়েছিলেন। আর সত্যবাদিতার জন্যই বোধহয় তিনি প্রেসিডেন্ট হয়েছিলেন। দিব্য দৃষ্টিতে আমি রিণ্টুকে দ্বিতীয় জর্জ ওয়াশিংটন হিসেবে দেখতে পেলুম। কি সরল মুখ করে রিণ্টু তখন বলেছিল, আমি চিনির বস্তায় হিসি করেছি! আমাদের পরিবারের একজন পরে প্রেসিডেন্ট হবে এই সম্ভাবনার কথা জানতে পারায়—আজ রিণ্টুকে নিয়ে আমাদের উৎসব করা উচিত। এর তুলনায় ৫০ কিলো চিনি কিংবা ২২৫টা টাকা তো কিছুই না।

কিন্তু তার জের চললো অনেকক্ষণ। মেজোকাকা আবার টাকা খরচ করে চিনি কিনতে প্রস্তুত, বদনামের ভয়ে। কাজলদির গোঁ—তিনিই ঐ টাকাটা দেবেন—নইলে শ্বশুরবাড়িতে তাঁর নিন্দে হবে। এর সঙ্গে এসে যোগ দিলেন ছোটমামা। ছোটমামার কেমিস্ট্রীতে বিলিতি ডিগ্রি আছে। তিনি দাবি তুললেন, আবার চিনি কিছুতেই কেনা চলবে না। ব্যবসায়ীরা গরুর হাড় পর্যন্ত ভেজাল দিচ্ছে, আর এ তো সামান্য বাচ্চা ছেলের হিসি। চিনি জ্বাল দিয়ে রসগোল্লার রস হবে—অতক্ষণ আগুনের জ্বালের পর কোনো দোষই থাকবে না! এতখানি চিনি নষ্ট হবে? দেশের এইজন্যই উন্নতি হচ্ছে না—যতসব কুসংস্কার! আত্মীয়-স্বজনের মধ্যে বাকি অনেকেরই দেখা গেল সাত পুরুষে কবে যেন কার ডায়াবিটিস ছিল—তাঁরা তো মিষ্টি খাওয়াই ছেড়ে দিয়েছিল—সুতরাং এতে তাঁদের কিছু যায় আসে না! কাজলদির স্বামী একটু বাদে এসে সব শুনে প্রথমেই রিণ্টুকে ডেকে ঠাস্ ঠাস্ করে দুটি চড় কষালেন, প্রেসিডেন্ট-এর বাবা হবার সম্ভাবনা তিনি মনে স্থানও দিলেন না।

অবস্থা যখন চরমে উঠলো, তখন এলেন মেজোকাকিমার গুরুদেব। দেওঘর থেকে তিনি দয়া করে এসেছেন বিয়ে উপলক্ষে। ভুঁড়িওলা বিশাল চেহারা, দেখলে ভয়-ভক্তি হয়। ঐসব গুরুদেবদের উপকারিতা আমি সেদিন বুঝতে পারলুম। অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা করার বেশ দ্রুত উপস্থিত বুদ্ধি ওঁরা ব্যবহার করতে পারেন। তিনি প্রথমে সব

ব্যাপারটা শুনলেন, এমন কি ছোটমামার তীব্র বক্তৃতা পর্যন্ত। তারপর স্মিতহাস্যে বললেন, ঐ চিনি যদি আমি খাই, তাহলে তোরা খাবি তো? শিশু হচ্ছে নারায়ণ, শোন তাহলে একটা গল্প, বৃন্দাবনে একদিন শ্রীকৃষ্ণ···। গল্পটা মহাভারত কিংবা কোনো পুরাণে যে নেই —সে সম্পর্কে আমি নিঃসন্দেহ। গল্পের মূল কথা শ্রীকৃষ্ণও নাকি একদিন যশোদার ননী মাখনে হিসি করে দিয়েছিলেন তাই দেখে সুদাম ঘেন্না প্রকাশ করায় শ্রীকৃষ্ণও বলেছিলেন, এখন থেকে শিশুর ইয়েকে যদি কেউ ঘেন্না করে—তাহলে আমার দয়া পাবে না। গুরুদেব ঐ চিনির বস্তায় গঙ্গাজল ছিটিয়ে দিয়ে বললেন, ওঁং শুদ্ধি, ওঁং শুদ্ধি।

চমৎকারভাবে সব মিটে গেল। শুধু ছোটকাকা আমাকে এক পাশে ডেকে ফিসফিস করে বললেন, তুই রান্নার ঠাকুরদের বলিস, চিনি আবার নতুন করে কেনা হয়েছে। দরকার কি যদি জিজ্ঞেস করে তাহলেই বলবি, না জিজ্ঞেস করলে কিছু দরকার নেই—

সেবার আমাদের বাড়ির রান্নার মধ্যে রসগোল্লাই হয়েছিল সবচেয়ে ভালো। রসগোল্লার নতুন ধরনের স্বাদের প্রশংসা করে গেলেন নিমন্ত্রিতরা সবাই। আর আমি? অতক্ষণ পরিবেশন আর অন্য বাড়ির মেয়েদের সঙ্গে ফষ্টি নষ্টি করার পর—আমার আর খাবার সময় কোথায়? আমি দুটো রসগোল্লা রিন্টুর মুখে গুঁজে দিয়েছিলুম!

দুই

সেই গল্পটা আশা করি মনে আছে? সেই মহাভারতে, যুদ্ধের পর—ভীষ্ম শরশয্যায় রয়েছেন, যুধিষ্ঠির এসে তাঁকে রোজ নানারকম

প্রশ্ন করেন—একদিন প্রশ্ন করলেন, দাদামশাই, নারী এবং পুরুষ—এদের মধ্যে কার জীবন বেশী সুখের ? (কি সময় কি প্রশ্ন ! তিন-কাল গিয়ে এককালে ঠেকেছে, ভীষ্ম মরতে বসেছেন, তার ওপর পিঠে অতগুলো তীর বেঁধানো—এ সময় তিনি বললেন নারী পুরুষের সুখের কথা ! তাছাড়া ভীষ্ম, যিনি সারাজীবনে কখনো কোনো নারীকে স্পর্শ করেননি, তিনি ওদের সম্পর্কে কি জানবেন ?)

কিন্তু দমলেন না ভীষ্ম। বললেন, প্রশ্নটা খুব জটিল বটে, কিন্তু এ সম্পর্কে একটি আখ্যান আছে—তার থেকেই এর উত্তর পাওয়া যায়। পাঠকরা গল্পটা নিশ্চয়ই জানেন। আমি সংক্ষেপে আবার মনে করিয়ে দিচ্ছি। পুরাকালে ভঙ্গস্বন নামে রাজা ছিলেন (হাতের কাছে মহাভারত নেই, নামটাম একটু ভুল হতে পারে—কিন্তু তাতে কিছু যায় আসে না।)—একদিন তিনি শিকারে বেরিয়ে গভীর অরণ্যে হারিয়ে গেলেন। তারপর তৃষ্ণার্ত হয়ে খুঁজতে খুঁজতে এক জলাশয়ের কাছে এলেন—সেই পুকুরটা ছিল অপ্সরাদের স্নানের জায়গা—পুরুষের সেখানে আগমন নিষিদ্ধ, রাজা তো জানেন না—তিনি যেই পুকুরে নেমেছেন, অমনি তিনি স্ত্রীলোক হয়ে গেলেন। পুরোনো সব কথাও তাঁর মন থেকে মুছে গেল। অনুচররা রাজাকে খুঁজে না পেয়ে ফিরে গেল, ভঙ্গস্বন এক রূপসী রমণী হয়ে থেকে গেলেন বনে। ক্রমে এক ঋষি-কুমারের সঙ্গে দেখা হলো তাঁর, দর্শন থেকে প্রণয়, প্রণয় থেকে বিবাহ। ঋষির বউ হয়ে আশ্রমে অরণ্যে সুখে দিন কাটাতে লাগলেন তিনি। কয়েকটি ছেলেমেয়েও হলো।

একদিন মহর্ষি নারদ খুঁজতে খুঁজতে এসে দেখতে পেলেন। তাঁকে নারদ চিনতে পারলেন দিব্যদৃষ্টিতে। তিনি রাজাকে (এখন ঋষি-পত্নী) বুঝিয়ে বললেন যে, তাঁর অভাবে রাজ্য ছারখারে যাচ্ছে—তাঁর আগের পক্ষের ছেলেরা ঝগড়াঝাটিতে মত্ত, সুতরাং তাঁর ফিরে যাওয়া উচিত। নারদ মন্ত্রঃপুত জল ছিটিয়ে তাঁকে আবার পুরুষ করে

দিলেন।

আশ্রম ছেড়ে, এ পক্ষের ছেলেমেয়ে ও স্বামীকে ছেড়ে, রাজধানীতে ফিরে এলেন রাজা। রাজ্যের সুবন্দোবস্ত করলেন। কিন্তু মনে সুখ নেই তাঁর। নারদকে ডেকে রাজা বললেন,—আমাকে আবার রমণী করে দিন, রমণী অবস্থায় আমি যে সুখ ও আনন্দ পেয়েছি—তার তুলনায় পুরুষের জীবন তুচ্ছ! আমি আবার সেই ঋষির আশ্রমেই ফিরে যেতে চাই। সত্যি সত্যিই, রাজ্য ছেড়ে আবার সেই ঋষির বউ হয়ে চলে গেলেন ভঙ্গস্বন। প্রমাণিত হলো, নারীর জীবনই বেশী সুখের।

আমি প্রায়ই ভাবি—এখনকার দিনেও, নারী পুরুষের মধ্যে কে বেশী সুখী? এই নিয়ে যদি একটা বিতর্ক প্রতিযোগিতা আরম্ভ করা যায়, তাহলে বুঝতে পারছি, মেয়েরা জ্বালাময়ী বক্তৃতা দিয়ে আসর সরগরম করে রাখবেন। প্রায়ই তো মেয়েদের মুখে অনুযোগ শুনি, আপনাদের ছেলেদের কি মজা! যখন যা খুশি করতে পারেন। জানি, সেই বিতর্ক সভায় মেয়েরা প্রমাণ করে ছাড়বেন—তাঁদের জীবন নিতান্ত বিড়ম্বনাময়, পুরুষেরা তাঁদের স্বাধীনতা খর্ব করে রেখেছে ইত্যাদি। পুরুষদের জীবনের সুখের প্রমাণ হিসেবে—তাঁরা বলবেন, পুরুষরা যখন যেখানে খুশি যেতে পারে, পুরুষরা টাকা উপার্জন করে, তারা দেশ শাসন করে, ইত্যাদি ইত্যাদি। এর সব কটার উত্তরই আমি দিতে পারি—মেয়েদের সামনা-সামনি দাঁড়িয়ে পারবো না, আড়াল থেকে।

আমার ধারণা, সব সভ্যতাই মাতৃতান্ত্রিক। পুরুষরা ক্রীতদাস মাত্র। তারা নির্বোধের মতন খেটে খেটে মরছে, কিন্তু কৃতিত্ব ও মজাটুকু সব নিয়ে নেয় মেয়েরা। পুরুষরা টাকা উপার্জন করে ঠিকই, কিন্তু সেই টাকা খরচ করে মেয়েরা, অবহেলায়, বিলাসিতায় যা খুশি। পুরুষরা অকারণে যুদ্ধ-বিগ্রহ করে মরে, দুরন্ত নদীর ওপর ব্রীজ বানানো থেকে শুরু করে প্রাণ তুচ্ছ করে সিংহের সঙ্গে লড়াই পর্যন্ত—

পুরুষদের এ সবকিছুই কোনো না, কোনো মেয়েকে খুশী করার জন্য। মেয়েরা এতেও খুশী হয় না, অবশ্য ঠোঁট উল্টে বলে, এ আর এমন কি, এ তো অনেকেই পারে। তুমি নিজে আলাদা বেশী কি পারো—তাই দেখাও! এই আলাদা হবার নেশা ধরিয়ে দেওয়াও মেয়েদের অন্যতম কৌশল। বেচারা পুরুষরা নদীতে ব্রীজ বানাবার পরেও আবার সমুদ্রে বাঁধ দিতে যায়, সিংহ হত্যা করার পর মানুষ হত্যায় মেতে ওঠে। ফরাসীরা বলে, 'শ্যারশো লা ফাম,' মেয়েটাকে খুঁজে আনো—সব দুর্ঘটনার আড়াল থেকে সেই মেয়েটাকে খুঁজে আনো। দিল্লীতে থাকবার সময় 'একজন হাইকোর্টের বিচারপতিকে দেখেছিলাম আদালতে কি দোর্দণ্ড প্রতাপ তাঁর—কিন্তু বাড়িতে তিনি পাঞ্জাবি না ড্রেসিং গাউন পরবেন--স্ত্রীর অনুমতি ছাড়া সেটুকু নির্বাচনের স্বাধীনতাও তাঁর নেই। মেয়েরা ইচ্ছে মতন যেখানে সেখানে যেতে পারে না বটে, কিন্তু ইচ্ছে মতন যখন তখন যেখানে সেখানে পুরুষদের পাঠাবার ক্ষমতা তাদের আছে। যাও, পার্ক সার্কাস থেকে নিয়ে এসো মাংস, বাগবাজার থেকে ইলিশ, বড়বাজার থেকে জর্দা—এসব হুকুম অবলীলাক্রমে বেরুবে তাদের মুখ থেকে। পুরুষদের চিন্তা-ভাবনা পরিকল্পনা একনিমেষে বদলে দিতে পারে মেয়েরা। স্বামী ঠিক করেছেন, ময়দানে মিটিং শুনতে যাবেন—স্ত্রী এসে বললেন, ওমা সেকি, আজ যে আমি সেজো মাসীর বাড়িতে যাবো—তাঁকে কথা দিয়ে ফেলেছি। এক বন্ধুর বাড়িতে ভিয়েৎনামের যুদ্ধ নিয়ে আমরা তর্কে মত্ত, দেশ ও পৃথিবীর দুঃসময় নিয়ে বন্ধুটি অত্যন্ত চিন্তিত—বন্ধু-পত্নী খানিকটা শুনলেন, বিরক্তভাবে হাই তুললেন, তারপর বললেন, ছাখো তো, অমুক হলে কি সিনেমা হচ্ছে? তোমার বন্ধু তো ওখানকার ম্যানেজার, ফোন করে ছাখো না—এখন টিকিট পাওয়া যাবে কি না। নিমেষে পৃথিবীর দুঃসময়ের কথা ফুৎকারে উড়ে গেল, আমরা ডুবে গেলুম, হিন্দী সিনেমার জগতে।

অন্য কথা থাক্। আমি মেয়েদের কয়েকটি বিশেষ সুবিধের

কথা উল্লেখ করতে চাই। প্রথমেই বলা যায়, মেয়েদের দাড়ি কামাতে হয় না। এটা যে একটা কতবড় সুবিধে—মেয়েরা তা বুঝবে না। ঝড় বৃষ্টি রোদ, ছুটির দিন কাজের দিন—এই যে প্রত্যেকদিন দাড়ি কামাবার অসহ্য একঘেয়েমি—এর হাত থেকে নিস্তার নেই পুরুষদের। আমি পারতপক্ষে আয়নার সামনে যেতে চাই না—কিন্তু দাড়ি কামাবার সময় আয়নার সামনে মুখ আনতেই হয়—তখন নিজেকে ভেংচি কাটি রোজ। ঠিক সময় ব্লেড কিনতে ভুলে গেলে, পুরানো ব্লেডে গাল ঘষার সময় ইচ্ছে করে নিজের গলায় এক কোপ বসিয়ে দিই। দাড়ি রাখবো, মাত্র দু' তিনদিন দাড়ি না কাটলেই মেয়েরা এমন বিশ্রীভাবে মুখ ঘুরিয়ে নেয়। আর মেয়েরাই যদি—দেখে মুখ ঘুরিয়ে নেয়—তাহলে আর সে মুখের মূল্য কি ?

মেয়েদের আর একটা সুবিধে তাদের শাড়ীর কোনো সাইজ নেই। যে-যার শাড়ী যখন তখন পরতে পারে—নিত্যনতুন সাজ পোশাকের অভাব হয় না তাদের। অথচ, বাড়ি থেকে বেরুবার আগে প্যান্ট সার্ট নিয়ে আমার প্রতিদিন দুশ্চিন্তা। প্যান্ট কাচা আছে তো জামা ইস্তিরি নেই। প্রতি মাসে একবার নাপিতের কাঁচির নীচে মাথা পেতেও দিতে হয় না মেয়েদের—অথচ এই ব্যাপারটা আমার কাছে অসীম বিরক্তিকর।

আর থাক্! তবে অবশ্য আমাকে আরও যতবার জন্ম নেবার সুযোগ দেওয়া হবে—আমি পুরুষই হতে চাইবো। কারণ, একটি জিনিস মেয়েরা একেবারেই পারে না—কিন্তু পুরুষদের সে ক্ষমতা আছে। মেয়েরা মেয়েদের ভালোবাসতে পারে না আমরা পারি। মেয়েদের দোষ মেয়েদেরই শুধু চোখে পড়ে, আমরা ও ব্যাপারে একেবারেই অন্ধ।

তিন

আমি ভাবছিলুম, আমি কোন্ দলে? কোলিয়ারির অফিসঘরে বসে আছি। সকালবেলা ভারী ব্রেকফাস্ট খাওয়া হয়েছে। চৌধুরী সাহেব খুব অতিথি-বৎসল, তাঁর বাড়িতে খাওয়াদাওয়ার এলাহী বন্দোবস্ত। সকালেই চায়ের সঙ্গে টোস্ট, বেকন, মার্মালেড আর খাঁটি ক্ষীর খাওয়ালেন, তারপর বললেন, চলুন, আমার সঙ্গে। খনির মধ্যে নামবেন তো!

খনিতে নামার ব্যাপারে আমার খুব উৎসাহ। খনি অঞ্চলে বেড়াতে এসে একবার অন্তত ভূগর্ভের অন্ধকার না-দেখার কোনো মানে হয় না। মৃত্যুর পর তো নরকে যাবোই, সুতরাং তার আগেই একবার পাতালের কাছাকাছি ঘুরে আসা যাক।

চৌধুরী সাহেব এখানকার চারটে খনির এজেন্ট অর্থাৎ এই বিস্তীর্ণ এলাকার দণ্ডমুণ্ডের বকলম অধিকর্তা। মালিকের অনু-পস্থিতিতে প্রতিনিধি হিসেবে তিনিই এখানকার সব। একদিন আমার এক বন্ধুকে কথায় কথায় বলছিলুম, আমার কিছুদিন খনি অঞ্চলে গিয়ে থাকতে ইচ্ছে করে খুব। বন্ধুটি সঙ্গে সঙ্গে বলেছিলেন, চলে যা না। আমার এক মাসতুতো দাদার আণ্ডারে চারটে খনি আছে, চিঠি লিখে দিচ্ছি, চলে যা।

সেই চিঠি নিয়েই এখানে আসা। চৌধুরী সাহেব ব্যস্ত মানুষ, কোলিয়ারি ছেড়ে বাইরে প্রায় যাওয়াই হয় না—অনেকদিন পর সহরের লোক পেয়ে তিনি খুশী হয়ে ওঠেন। অমায়িক, হাসিখুশী মানুষ—সাহিত্য-শিল্পেও উৎসাহ আছে, শরীরটাও মজবুত।

খাদে নামব সব ঠিকঠাক মাথায় সাদা রঙের হেলমেট পরে

নিয়েছি, কোমরেও চওড়া বেল্ট লাগানো, ব্যাটারি—হাতে জোরালো টর্চ—চৌধুরী সাহেব নিজে আমার সঙ্গে নামবেন, এমন সময় একটা দূরপাল্লার টেলিফোন এলো। চৌধুরী সাহেব বললেন, তা হলে আর একটু বসুন, আর এক কাপ চা খেয়ে নিন বরং, আমি টেলিফোনটা সেরে নিচ্ছি।

সেই থেকে আরও দেরী হয়ে গেল। টেলিফোন শেষ হয়েছে, এমন সময় আর্দালি এসে খবর দিল, সেই চারজন লোক আবার দেখা করতে এসেছে। 'সেই চারজন' শুনেই বিরক্তিতে চৌধুরী সাহেবের মুখ কুঁচকে গেল, বিড়বিড় করে কি যেন বললেন, আর্দালিকে কিন্তু বললেন, যাও ডেকে নিয়ে এসো! আমার দিকে চোখের এমন একটা হতাশ ইঙ্গিত করলেন, যার অর্থ, আরও খানিকক্ষণ বসতেই হবে!

ভেবেছিলুম, হোমরা-চোমরা কেউ হবে, কিন্তু সেই চারজনকে দেখে আমি হতাশ হলুম। চারজন অতি সাধারণ গেঁয়ো লোক—একজন ছোকরা আর তিনজন বুড়ো, বুড়োদের মধ্যে একজনের গায়ে ফতুয়া আর চোখে গোল চশমা—নিকেলের ফ্রেম, বাংলা নাটক এবং সিনেমায় গ্রাম্য কুচক্রী বদমাইশদের চেহারা যেমন থাকে—সেই রকম। তারা এসে বললো, স্যার সেই জমির ব্যাপারটা নিয়ে কথা বলতে এলাম।

চৌধুরী সাহেবের মুখের বিরক্ত ভঙ্গি তখন সম্পূর্ণ অন্তর্হিত হয়ে গেছে, হেসে বললেন, হ্যাঁ, হ্যাঁ, বসুন বসুন. এই রঘুয়া, বাবুদের চেয়ার দে। চা খাবেন তো?

গোল চশমা বুড়োটি বিগলিতভাবে বললো, না, স্যার। আপনি ব্যস্ত লোক, বেশী সময় নষ্ট করবো না—আমাদের সেই জমিতে জল ঢোকার ব্যাপারে···

চৌধুরী সাহেব বললেন, হ্যাঁ, হ্যাঁ, সে সব কথা হবে। আগে চা খান। চা খেতে আপত্তি কি! এই রঘুয়া—

আমি এক পাশে চুপ করে বসে সিগারেট ধরালুম। লক্ষ্য করলুম

দিনকাল সত্যিই অনেক বদলে গেছে। চৌধুরী সাহেব তিন হাজার টাকার মতন মাইনে পান, ফুলবাগান সমেত বিশাল কম্পাউণ্ড নিয়ে তাঁর বাড়ি, ব্যক্তিগত ব্যবহারের জন্য ছ'খানি মোটর গাড়ি। তাঁকে কেউ চৌধুরীবাবু বলবে না, বলবে চৌধুরী সাহেব। এই সব সাহেবরা তো চিরকালই ঐ ধরনের গেঁয়ো লোকদের তুই-তুকারি বলে কথা বলেছেন, হারামজাদা, শুয়োরের বাচ্চা—এই সব আদরের সম্বোধন করেছেন। চেয়ারে বসানো? চা খাওয়ানো? স্বপ্ন বলে মনে হয়। শুধু যে চৌধুরী সাহেবই ওদের চেয়ারে বসিয়ে চা খাওয়ানোর জন্য ব্যস্ত, তাই নয়, ঐ হেঁজিপেঁজি গেঁয়ো লোকগুলোও কিন্তু চেয়ারে বসতে একটুও আড়ষ্ট বোধ করলো না, অবলীলাক্রমে চুমুক দিলো চায়ের কাপে—একজন আবার আর্দালির দিকে চেয়ে বললে, আর একটু চিনি দাও হে! ঠিক মিঠা হয়নি।

ধীরে সুস্থে চা শেষ করে তারা বক্তব্য শুরু করলো। গাঁয়ের অশিক্ষিত অর্ধনগ্ন লোক হলেও তেমনটি আর হাবাগোবা নেই, বেশ গুছিয়ে কথা বলতে জানে—এমন কি ছু চারটে ইংরেজি শব্দও ব্যবহার করে।

বৃত্তান্তটি এই। ওরা কোলিয়ারি সংলগ্ন গ্রামের চাষা। কোলি-য়ারির বয়লার থেকে বিষাক্ত গরম জল ওদের জমির ওপর দিয়ে গড়িয়ে গেছে, তাতে জমির ফসলই শুধু নষ্ট হয়নি। জমি একেবারে চাষের অযোগ্য উষর হয়ে গেছে। সেইজন্য ওরা কমপেনসেশন চায়। সেই জল পুকুরে পড়ায় পুকুরের মাছও মরে গেছে। সুতরাং ওদের মহা সর্বনাশ, ওরা খাবে কি? ওরা ক্ষতিপুরণ চায়—তার অঙ্কও নেহাৎ কম নয়।

চৌধুরী সাহেবের বক্তব্য, গরম জল গড়িয়ে গেছে ঠিকই, সেই জল ফসলের গোড়ায় লাগলে ফসলও মরে যেতে পারে—কিন্তু ঐ জল মোটেই বিষাক্ত নয়, ঐ জল শিশিতে ভরে ডিষ্টিল্‌ড ওয়াটার হিসেবে বেচা যায় পর্যন্ত। সুতরাং জমি নষ্ট হয়ে যাওয়ার কথাটা

বাজে, পুকুরে মাছ মরে যাবার কথাটা গুজব—এখন ক্যানাল কেটে দেওয়া হয়েছে এখন সমস্ত জমির ওপর জল ছড়ায় না—এবং পুকুর পর্যন্ত পৌঁছুতে পৌঁছুতে জল ঠাণ্ডা হয়ে যায়। ঐ জলকে বিষাক্ত বলার কোনো মানে হয় না!

নিকেল চশমা বুড়ো বললো, না স্যার, জমির ঘাসগুলো পর্যন্ত একেবারে হল্‌দে হয়ে গেছে। সেই ঘাস মুখে দিয়ে একটা গরু…

চৌধুরী সাহেব ওর বাক্যের মাঝপথেই থামিয়ে দিয়ে বললেন, মরে গেছে তো? গরুটা ঘাস মুখে দিল আর ধপাস্ করে মরে পড়ে গেল। তাই না? শুনেছি আমি সে গল্প। কিন্তু সেই মরা গরুটা কে দেখেছেন আপনাদের মধ্যে? কেউ দেখেছে?

আজ্ঞা স্যার, গদাই—

—গদাই বলেছে তো? জানি, তাও জানি। গদাই-এর নিজের কি কোনো গরু আছে? আপনাদের সারা গাঁয়ে এক মাসের মধ্যে একটাও গরু মরেনি—আমি খবর নিয়েছি। গদাই তো বলবেই। সে অমুক পার্টির লোক—সে তো চায়ই সব সময় একটা হাঙ্গামা বাধাতে—সে আবার আজকাল লীডার হচ্ছে?

—তাহলে আমাদের ক্ষতিপূরণের ব্যাপারটার এবার একটা ফয়সালা করেন।

মুখ থেকে পাইপটা সরিয়ে চৌধুরী সাহেব এবার উঠে দাঁড়ালেন। বেশ আবেগের সঙ্গে বলতে লাগলেন, আপনাদের যদি চাষের ক্ষতি হয়ে থাকে—তবে তার ক্ষতিপূরণ কোম্পানি নিশ্চয়ই দেবে। স্থানীয় লোকের অসুবিধে করে কোম্পানি ব্যবসা চালাবে না। কিন্তু, আমি একটা কথা বলছি শুনুন। এই যে জমি নষ্ট হয়ে গেছে—এ গুজব ছড়াবেন না। ঐ জমি আবার চাষ করুন। আমাদের দেশে এখন আরও খাদ্যের দরকার। আমি নিজের পকেট থেকে আপনাদের বীজ ধানের খরচা দিচ্ছি। বয়লারের জল আমি অনায়াসেই অন্য-দিকে ঘুরিয়ে নদীতে ফেলে দিতে পারি। কিন্তু আপনাদেরই চাষের

সুবিধের জন্য ঘণ্টায় চারশো গ্যালন করে জল বিনা পয়সায় পাচ্ছেন—সেই জল পুকুরে জমিয়ে যদি সেচের কাজে লাগান—

—ও জল কেউ ছোঁবে না। সবাই জানে, ওতে বিষ আছে।

—বিষ আছে? চলুন আপনাদের সঙ্গে আমি যাচ্ছি—আমি নিজে আপনাদের সামনে সেই জল খেয়ে দেখবো কেউ মরে কিনা—আমারও তো প্রাণের দাম আছে? না কি নেই?

—গাঁয়ের লোকে আমাদের পাঠিয়েছে, আপনি ক্ষতি পূরণের টাকাটার কথা বলুন স্যার। ও জমিতে আর ফসল হবে না—মেহনৎ করে রক্ত সব ঘাম করে ফেললেও কিছু হবে না—

ব্যাপারটা অত্যন্ত ঘোরালো। আমি বাইরের লোক, আমার কোনো কথা বলা উচিত নয় বলেই আমি চুপ করে রইলুম। মনে মনে ভাবতে লাগলুম, আমি কোন্ দলে? কোন পক্ষ আমি সমর্থন করবো? চৌধুরী সাহেব যে যুক্তি দেখাচ্ছেন, তা কি পুরো সত্যি? কমপেনসেশনের কথাটা এড়িয়ে গিয়ে তিনি ভাব দেখাচ্ছেন যেন তিনি ওদের উপকার করার জন্যই ব্যগ্র। কিন্তু কোথাও একটা গোলমাল আছে। কমপেনসেশনের টাকা একবার দিলে কি বার বার দিতে হবে? জল সরাবার সত্যিই কি অন্য উপায় আছে? এ কথা ঠিক, চৌধুরী সাহেব কোম্পানি স্বার্থ টেনেই কথা বলবেন। কোম্পানি তাঁকে তিন হাজার টাকা মাইনে দিচ্ছে কি এমনি এমনি? লোকগুলোকে আপনি বলা, চা খাওয়ানো—এ সবই হয়তো কৌশল, সহজে কাজ হাঁসিল করার চেষ্টা। একটা জটিল সমস্যার সহজ মীমাংসা করতে পারলে তিনি মালিকের কাছ থেকে বাহবা পাবেন—সেইজন্যই কি দেশের খাদ্য সমস্যার উল্লেখ করে তাঁর গলায় ওরকম আবেগ ফুটেছে?

আমি চৌধুরী সাহেবের পক্ষে নিশ্চয়ই নই। চৌধুরী সাহেব দেখছেন মালিকের স্বার্থ। যে মালিক নিষ্কর্মাভাবে রাজস্থান বা গুজরাটে বসে থেকে মোটা মুনাফা ভোগ করছে। আমি কেন তার

পক্ষে যাবো? চৌধুরী সাহেবের আত্মীয় আমার বন্ধু, তার চিঠি আমি নিয়ে এসেছি—এবং আমি লিখিটিখি শুনে তিনি আমাকে খাতির করছেন। কিন্তু বিনা সুপারিশে যদি আসতুম, উনি আমাকে নিশ্চিত পাত্তাই দিতেন না। আমি একজন সাধারণ লোক—আমি কেন ঐ বুর্জোয়াদের পক্ষে যাবো?

আমি কি ঐ গ্রাম্যলোকগুলোর পক্ষে? তাতেও আমার মন সায় দিচ্ছে না। স্পষ্ট বুঝতে পারছি, বয়লারের জলকে বিষাক্ত বলা ওদের ইচ্ছাকৃত গুজব রটনা। গরু মরার খবরটা মিথ্যে। লোক-গুলোর চেহারা দেখলেই বোঝা যায়—ওরা অলস আর ধূর্ত। খেটে খাবো শ্রমের যথার্থ মূল্য চাইবো—এ রকম কোনো মনোভাব ওদের নেই। এখানকার জমিতে কঠিন পরিশ্রম করে ফসল ফলাতে হয়—সেই পরিশ্রম এড়াতে চাইছে। গ্রামের সরল, নির্যাতিত চাষা এদের কিছুতেই বলা যাবে না। আবার জমি চাষ করলেই যদি প্রমাণ হয়—জমি নষ্ট হয়নি—সেইজন্য চাষের কথা তুলতেই চাইছে না। ভাবখানা এই, এজেন্ট সাহেবকে এবার খুব প্যাঁচে পাওয়া গেছে—ওঁর কাছ থেকে যতটা পারা যায় টাকা খিঁচে নিয়ে তারপর পায়ের ওপর পা দিয়ে খাওয়া যাবে! যদি রাজী না হয় তা হলে আন্দোলন, শ্রমিক ধর্মঘটের ভয় দেখালেই হবে। না, ঐ নিষ্কর্মা মতলোববাজ-গুলোর পক্ষ সমর্থন করাও আমার পক্ষে সম্ভব নয়।

আমি কোনো দলেই যেতে পারবো না। আমি সাধারণ মধ্যবিত্ত, মাঝখানে ঝুলে থাকাই আমার নিয়তি। আমার বুকের মধ্যে একটা অপ্রয়োজনীয় বিবেক আর গুচ্ছের যুক্তি ঠাসা। সুযোগ পেলে, ঐ দুজনই আমাকে লাথি মারবে।

ধুত্তোর! এর চেয়ে খনিতে নেমে অন্ধকারে ঘুরলে অনেক বেশী ভালো লাগতো।

চার

কি খাবেন বলুন? চা না কফি? আমি রীতিমত চিন্তার ভান করে বললুম, উঁ, কোনটা খাওয়া যায়? কিছু কি খেতেই হবে? দুটোর একটাও যদি না খাই?

ঝর্ণা হেসে ফেলে বললো, আপনি না খেতে চাইলে কি আপনাকে আমি জোর করে খাওয়াবো? কেন, কিছু খাবেন না কেন? ঠাণ্ডা কিছু খাবেন?

—ঠাণ্ডা মানে?

—স্কোয়াশ আছে। লেমনেড বা কোকোকোলা আনিয়ে দিতে পারি। যা গরম পড়েছে!

—না, না, ওসব নয়! গরমে গরম জিনিসই আমার পছন্দ। আচ্ছা তা এক কাপ চা-ই দিন। শুধু চা কিন্তু, না থাক, বরং কফিই করুন। কিংবা চা—কোনটা তাড়াতাড়ি হবে?

—আপনি কোনটা খাবেন বলুন না! কতক্ষন আর লাগবে?

—আপনাকেই বানাতে হবে তো? না লোক আছে? তাহলে ওসব থাক না, এই তো বেশ বসে বসে গল্প হচ্ছে।

—যা, আপনি ঠিক করে কিছু বলতে পারেন না। দাঁড়ান চা করে আনছি। আমারও খেতে ইচ্ছে করছে।

ঝর্ণা চা করে আনতে গেল। গরম জল চাপিয়েই তার ফিরে আসার কথা। তারপর জল গরম হলে আবার গিয়ে চা ভেজাবে। কিন্তু এলো না! আমি উঁকি মেরে দরজার কাছে দেখলাম, ঝর্ণা হিটারে কেটলি চাপিয়ে কাপ ডিস ধুচ্ছে। চা বানিয়ে ওর আসতে আরও চার পাঁচ মিনিট লাগবেই।

আমি সতর্ক ক্ষিপ্র পায়ে এগিয়ে গেলাম টেবিলের দিকে। টেবিলের ওপরেই চাবির গোছা পড়েছিল। আলমারির চাবিটা খুঁজে বার করতে একটু সময় লাগলো। তারপর আলমারির পাল্লায় যাতে ক্যাচ ক্যাচ শব্দ না হয়, সেইজন্য খুব সাবধানে নিঃশব্দে আমি আলমারিটা খুলে ফেললাম। এতক্ষণ চা কফির নামে টালবাহানা করতে করতে আসলে আমি মনস্থির করে নিচ্ছিলাম।

পাঠক নিশ্চয়ই আমাকে চোর ভাবছেন। তা ভাবুন, কি আর করা যাবে! অবস্থার গতিকে মানুষ কত কি করে!

ঝর্ণার সঙ্গে আমার বন্ধু সুকান্তর বিয়ে হয়েছে। বছরখানেক মাত্র তাও বিয়ের পর মাসখানেকের জন্য ওরা সাউথ ইণ্ডিয়ায় বেড়াতে গিয়েছিল, তারপর ঝর্ণা দু মাস ছিল পাটনায় ওর বাপের বাড়ি। সুতরাং ঝর্ণার সঙ্গে ভালো করে আমার আলাপই হয়নি। এই তো কয়েকমাস মাত্র ওরা নতুন ফ্ল্যাট ভাড়া নিয়ে গুছিয়ে বসেছে।

সুকান্ত যখন বাড়ি থাকে না, সেই সময়টা জেনেই এসেছি। সুকান্তটা মহা ধুরন্ধর ছেলে, ও বাড়িতে থাকলে সুবিধে হবে না। এখন ফ্ল্যাটে শুধু বাচ্চা চাকর আর ঝর্ণা। ঝর্ণা শুধু সুন্দরীই নয়, মনটাও খুব নরম। এই আমার সুযোগ। পাঠক, নিশ্চয়ই আমাকে চোর ছাড়াও অন্য কিছু ভাবছেন। তা ভাবুন, কি আর করা যাবে।

ঝর্ণা চা নিয়ে ফিরে আসার আগেই আমি আবার আমার জায়গায় ফিরে এসে বসেছি। আলমারি যথারীতি বন্ধ। চাবি আবার টেবিলের ওপর।

চায়ে চুমুক দিয়ে বললাম, অপূর্ব। অনেকদিন এমন সুন্দর চা খাইনি!

ঝর্ণা জিজ্ঞেস করলো, চিনি ঠিক হয়েছে তো? আপনি কতটা চিনি খান জানি না।

আমি বললাম, একেবারে নিখুঁত হয়েছে! এক একজনের হাতই এমন থাকে যে সেই হাতে চা বানালে কতটা চিনি কতটা দুধ তার

কোনো প্রশ্নই আসে না—

বাবারে বাবা! এই কথাটা যে ছেলেরা কত মেয়েকেই বলতে পারে!

—আপনাকে আগে কেউ এরকম বলেছে?

—বলেনি আবার!

—কিন্তু কথাটা পুরোনো হয়ে গেছে কি? শুনলে এখনো একটু একটু আনন্দ হয় না?

ঝর্ণা হাসলো। প্রসঙ্গ বদলে বললো, আপনার বন্ধুর কাছ থেকে আপনার অনেক গল্প শুনেছি, আগে খুব দেখা হতো আপনাদের দুজনের তাই-না? কই আপনি তো এ বাড়িতে বেশী আসেন না।

—সুকান্ত চায় না যে আমরা এখানে বেশী আসি।

—যাঃ? ও বলেছে একথা?

—ঠিক মুখে বলেনি—কিন্তু এখন নতুনভাবে ঘরটর সাজিয়েছে, সুন্দরী স্ত্রী বাড়িতে—এখন আর ব্যাচিলর আমলের বন্ধুদের কেউ তেমন পছন্দ করে না!

—মোটেই নয়। দাঁড়ান, ও আজ আসুক তো, আজ আপনার সামনেই ওকে জিজ্ঞেস করবো। ও এক্ষুণি ফিরবে।

—এখন ফিরবে? এখন তো সাড়ে চারটে বাজে। সুকান্তর অফিস থেকে ফিরতে ফিরতে সাড়ে ছটা সাতটা হয় না?

—অন্যদিন তাই হয়, তবে আজ তাড়াতাড়ি ফিরবে। আজ ইভনিং শো-এ একটা সিনেমায় যাবার কথা আছে।

সুকান্ত তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরবে শুনে আমি চঞ্চল হয়ে উঠলাম। তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়িয়ে বললাম, তাহলে আমি আজ চলি। আমার একটু কাজ আছে।

ঝর্ণা অবাক হয়ে বললো, এক্ষুণি যাবেন? ওর সঙ্গে দেখা করে যাবেন না?

—আজ আর না, আর একদিন…

প্রায় দরজার কাছে চলে এসেছি, এই সময় ঝর্ণা আমার হাতের বইগুলো লক্ষ্য করলো। জিজ্ঞেস করলো, আপনার কাছে, ওগুলো কি বই? গল্পের বই আছে নাকি—অনেকদিন পড়িনি—

আমি একগাল হেসে বললাম, ও আপনাকে বলতে ভুলেই গেছি। দেখুন তো কি ভুলো মন আমার। এগুলো আপনাদেরই বই। সুকান্তকে বলবেন এগুলো আমি পড়তে নিয়ে গেলাম।

ঝর্ণার মুখখানা মুহূর্তে কালো হয়ে গেল। লীলায়িত হাতে চূর্ণ অলক ঠিক করছিল, হাতখানা রয়ে গেল সেখানেই। বললো, কোথায় ছিল বইগুলো?

আমি কিন্তু মুখের হাসি মুছিনি। বললাম, আলমারিতে, আপনি যখন চা করতে গিয়েছিলেন, তখন আপনাদের আলমারির বইগুলো দেখছিলাম। অনেকদিন ধরেই এই বইগুলো—

ঝর্ণা বললো, ও কিন্তু বইয়ের আলমারিতে কেউ হাত দিলে বড় রাগ করে। আমাকে স্ট্রিক্টলি বারণ করে দিয়েছে কারুকে বই দিতে—

সে কি আর আমি জানি না। সুকান্তর স্বভাব এতদিন বাদে ঝর্ণা আমাকে বোঝাবে? এমন কি, বইয়ের আলমারির এককোণে ছোট্ট নোটিশ ঝুলিয়ে রেখেছে, "আমার একখানা পাঁজরা চান দিতে রাজি আছি। বই চাইবেন না।"

আমি তবু হা হা করে হেসে বললাম, আরে, ওসব কথা অন্যদের জন্য। সুকান্তর সঙ্গে আমার সে রকম সম্পর্কই নয়। আমরা হস্টেলে এক ঘরে থাকতাম, এক বিছানায় শুয়েছি, এক ব্লেডে দাড়ি কামিয়েছি—

সেই মুহূর্তে জুতো মশমশিয়ে সুকান্ত এসে ঢুকলো। আমাকে দেখে বললো, কি রে, আজকাল পাত্তাই পাই না কেন তোর।

ঝর্ণা এমনিতে খুব ভদ্র। সুকান্ত ফেরা মাত্রই বইয়ের কথা তুললো না। বরং মুখোজ্জ্বল করে বললো আপনি তা হলে আর

একটু বসুন। এক্ষুণি যাবেন কি ?

খানিকটা বাদে সুকান্ত যখন ঘন ঘন আমার হাতের বইগুলোর দিকে তাকাচ্ছে, আমি নিজে থেকেই বললাম সুকান্ত, আমি এই কটা বই পড়তে নিচ্ছি, কবে ফেরৎ দেব ঠিক নেই। তাড়া দিসনি।

সুকান্তর মুখখানাও কালো হয়ে গেল। ঝর্ণার দিকে একবার কটমট করে তাকালো। অর্থাৎ, তুমি বুঝি ওকে আলমারি খুলে দিয়েছো ? তারপর আমার দিকে তাকিয়ে কঠিনভাবে বললো, দেখি, কি কি বই ?

আমি সহাস্যে বইগুলো এগিয়ে দিলাম। পাঁচখানা বই, সুকান্ত প্রত্যেকটার পাতা উল্টে দেখলো, মুখ তুলে আমার চোখে চোখ রাখলো। আমিও তীব্র দৃষ্টিতে চেয়ে রইলাম। দুটি নেকড়ে বাঘ যেন পরস্পরের ওপর লাফিয়ে পড়ার জন্য তৈরী।

ঝর্ণা আমার দিকে তাকিয়ে বললো আপনি তাহলে আর একটু চা খান ! ওর জন্য তো চা করবই—

—হ্যাঁ চা খাবো। সঙ্গে যদি আরও কিছু থাকে, তাতেও আপত্তি নেই।

ঝর্ণা ঘর থেকে বেরিয়ে যাওয়া মাত্রই আমি সুকান্তকে ফিসফিস করে বললাম ছাখ চাঁদু, বেশী চালাকি করবি তো বউয়ের সামনে প্রেসটিজ পাংকচার করে দেবো !

ঝর্ণা ঘরে ফেরা মাত্রই সুকান্ত অতিশয় উৎসাহ দেখিয়ে বললো, আরে, ওর কথা আলাদা ! ও যখন যে বই চাইবে দেবে। ও আমার কত কালের বন্ধু ওর সঙ্গে আমি···

সুকান্তর আলমারি থেকে যে পাঁচখানা বই বেছে নিয়েছি, তার প্রত্যেকটিই আমার। এর মধ্যে একখানা আবার ব্রিটিশ কাউন্সিলের বই, আমাকে টাকা গচ্চা দিতে হয়েছে। সুকান্ত বন্ধুবান্ধবদের কাছ থেকে বই নিয়ে চিরকাল মেরে দিয়েছে। বেশী পীড়াপিড়ি করলে সুকান্ত মুখ কাঁচুমাচু করে বলতো, বইগুলো হারিয়ে গেছে !

এখন সুকান্ত বিয়ে করেছে। ওর বউ আলমারি কিনে সব বই সাজিয়ে রেখেছে। এখন এই আমাদের সুযোগ মাঝে মাঝে ওর বাড়িতে এসে চা খাওয়া বইগুলো ফেরৎ নিয়ে যাওয়া।

পাঁচ

ছেলেবেলায় ইস্কুলে সবাইকেই প্রায় একটা রচনা লিখতে হয়। তোমাকে যদি এক লক্ষ টাকা দেওয়া হয়, তাহা হইলে তুমি কি করিবে? আমি লিখেছিলুম, আমি ঐ টাকা দিয়ে একটা ছোটখাটো জাহাজ কিনে কোনো একটা দ্বীপ দেখতে যাবো। খুব বকুনি খেয়েছিলুম মাস্টারমশাইয়ে কাছে। কেননা, ঐসব রচনায় লিখতে হয়, টাকা পেলে ইস্কুল বানাবো কিংবা হাসপাতাল করবো কিংবা গরিব দুঃখীকে দান করবো—এই ধরনের। একেই তো আমার বাংলা লেখা খুবই কাঁচা, তার ওপর ঐ রকম স্বার্থপর চিন্তা—সেই রচনায় আমি কুড়ির মধ্যে ছয় পেয়েছিলাম মোটে। কুড়ির মধ্যে আঠারো পেয়েছিল শৈবাল, আমারই পাশে বসতো সে। শৈবাল সবিস্তারে প্রচুর আবেগের সঙ্গে বর্ণনা দিয়েছিল, ঐ টাকায় সে তাদের দেশের গ্রাম থেকে শহর পর্যন্ত একটা রাস্তা তৈরী করে দেবে, গ্রামবাসীর অনেক দুঃখ দূর হবে।

যাই হোক, আমি এখনো আমার মত বদলাইনি। কিংবা আমার মত বদলাবার সুযোগ দেবার জন্য কেউ আমাকে এক লক্ষ টাকা দিয়েও দেখেনি। সুতরাং আমি কল্পনা করতে ভালোবাসি যে, ঐ রকম কিছু টাকা পেয়ে গেলে আমি একটা জাহাজ কিনে ফেলবোই—এবং সেই জাহাজে চড়ে নতুন নতুন দ্বীপ দেখতে যাবো। এক লক্ষ টাকায় জাহাজ পাওয়া না-যাক, ছোটখাটো স্টিমার বা মোটর-বোট

হলেও আমার চলবে। এক একজন মানুষের জীবনে এক একটা বিশেষ শখ থাকে—আমার শখ, কোনো জনমানবহীন দ্বীপে বেড়াতে যাওয়া। কোনোদিন এই শখটা মিটবে না বলেই কল্পনা করতে বেশী ভালো লাগে। এইজন্যই, 'পদ্মানদীর মাঝি'র হোসেন মিঞা আমার প্রিয় চরিত্র।

গত সপ্তাহে আমার স্কুলের বন্ধু পরিতোষের সঙ্গে বহুদিন পর দেখা। সে বললে, খবর শুনেছিস?

—কি খবর?

—তুই শুনিসনি এখনো? সব্বাই জানে—শৈবাল লটারির টাকা পেয়েছে।

—কোন্ শৈবাল?

—সেই যে ইস্কুলে আমাদের সঙ্গে পড়তো, আমরা বলতাম মোটা শৈবাল—

—হ্যাঁ, হ্যাঁ, তাই নাকি? কোন্ লটারি, কত টাকা?

শৈবাল স্কুলে পড়াশুনোয় বেশ ভালো ছেলে ছিল। বাংলায় ফার্স্ট হতো প্রত্যেকবার। কিন্তু সেজন্য সে এখন বাংলার অধ্যাপক কিংবা সাহিত্যিক হয়নি, কি একটা ওষুধের কম্পানিতে কেমিস্টের চাকরি করে। স্কুলে ওর পাশাপাশি বসতাম আমি, অথচ বহুকাল ওর সঙ্গে দেখা হয় না।

পরিতোষের সঙ্গে শৈবালের এখনো যোগাযোগ আছে। পরিতোষ বললো, চল্, শৈবালকে কংগ্রাচুলেশান জানিয়ে আসি! লটারিতে প্রাইজ পাওয়া কি চাট্টিখানি কথা, ক্ষণজন্মা লোক না হলে পায় না!

খবরের কাগজে প্রায় প্রত্যেক সপ্তাহেই লটারির ফলাফলের বিজ্ঞাপন দেখতে পাই। অর্থাৎ প্রত্যেক সপ্তাহেই এদেশে একজন নতুন লাখপতি জন্মাচ্ছে। ভারী চমৎকার লাগে ভাবতে। এই

রকমভাবে ভারতের পঞ্চান্ন কোটি লোকই যদি কোনো একদিন লাখপতি হয়ে যায় তাহলে এক অপূর্ব সোসালিজমের জন্ম হবে। আমি লটারির টিকিট কাটি না—কারণ একথা ঠিক জানি, পঞ্চান্ন কোটি লোকের আর সব্বাই যদি লাখপতি হয়ে যায়—তাহলে আমি তো আর একা বাকি থাকতে পারি না—তাতে দেশের বদনাম হবে। তখন গর্ভনমেণ্ট থেকে এমনি এমনিই এক লাখ টাকা দিয়ে দেবে নিশ্চয়ই।

কিন্তু আমি এ পর্যন্ত কোনো কোনো লটারির টাকা পাওয়া লোককে স্বচক্ষে দেখিনি। ফার্স্ট প্রাইজ তো দূরের কথা, একশো টাকার প্রাইজও চেনাশুনো কেউ পেয়েছে বলে শুনিনি। অচেনা লোকরাই ওসব পায়। কিন্তু শৈবাল আমাদেরই স্কুলে পড়তো যে মোটা শৈবাল, সে প্রাইজ পেয়েছে তাকে একবার চোখে দেখার লোভ সামলাতে পারলুম না। গেলুম পরিতোষের সঙ্গে।

গিয়ে শুনলাম শৈবাল তখনো অফিস থেকে ফেরেনি। শৈবালের স্ত্রী অলকা চেনে পরিতোষকে। সে আমাদের বসতে বললো। শৈবালের বোন অঞ্জনা, যাকে ছেলেবেলায় চিনতাম, চা দিয়ে গেল। চায়ের সঙ্গে দুটি ক্রিম ক্র্যাকার।

আমি আশা করেছিলাম, এসে দেখবো, সারা বাড়িতে একটা বিরাট হৈ-চৈ চলছে, প্রচুর আত্মীয়-স্বজন এসেছে দারুণ খাওয়া-দাওয়া। লাখ টাকা প্রাইজ পেয়েও শৈবাল অফিস যাবে—এটাও আশা করা যায় না। অলকা আর অঞ্জনার মুখে কোনো চাপা উল্লাসের চিহ্নও নেই। অঞ্জনা আমাদের সঙ্গে দু'চারটে কথা বলে ভিতরে চলে গেল। পরিতোষ ফিসফিস করে আমাকে জানালো, অঞ্জনা একটা বখাটে ছেলেকে বিয়ে করতে চায় বলে—ওকে বাড়ি থেকে বেরুতে দেওয়া হয় না।

একটু বাদেই শৈবাল এলো, বেশ কিছুটা অবাক খানিকটা খুশীও হলো। জিজ্ঞেস করলো, চা খেয়েছিস? আমাদের চা

খাওয়া হয়ে গেছে শুনে ও আর দ্বিতীয়বার অনুরোধ করলো না—শুধু নিজের জন্য চা দিতে বললো। অনুযোগ করে জানালো, অফিসে বড্ড কাজের চাপ, রোজ ওভারটাইম করতে হয়—সাড়ে ছ'টার আগে বেরুতে পারে না।

শৈবাল গেল অফিসের জামা-কাপড় ছেড়ে আসতে। পরিতোষ আবার ফিসফিস করে বললো, এতগুলো টাকা পেয়েও শৈবালটা কিরকম কিপ্যুস আছে দেখলি? এতদিন বাদে এলাম, দিল কিনা শুকনো চা-বিস্কুট।

—বাঃ, টাকা পেয়েছে বলেই কি দু'হাতে ওড়াবে নাকি?

—ওড়ানোর কথা হচ্ছে না। চায়ের সঙ্গে দুটো সিঙ্গাড়া আর সন্দেশ দিতে পারতো না?

—চুপ, শৈবাল আর অলকা আসছে।

কথায় কথায় লটারির টাকা পাওয়ার কথা উঠলোই। শৈবাল পেয়েছে হরিয়াণার সেকেণ্ড প্রাইজ এক লক্ষ টাকা। অলকা রীতিমতন আপশোস করতে লাগলো, ফার্স্ট প্রাইজ না-পাওয়ার জন্য। ফার্স্ট প্রাইজ ছিল পাঁচ লক্ষ টাকা। একবার লাক কেটে গেলে আর কি পাওয়া যায়! অলকা, নাকি আগেই ভেবেছিল সি গ্রুপের টিকিট এবার ফার্স্ট প্রাইজ পাবে—ওর মন বলছিল। সি গ্রুপেরই টিকিট কিনেছে—সি গ্রুপ থেকেই এবার ফার্স্ট আর সেকেণ্ড প্রাইজ উঠেছে—কিন্তু ওদেরটাই হয়ে গেল সেকেণ্ড।

প্রাইজ পাবার পুরো কৃতিত্বটাই অলকা নিতে চায়। শৈবাল বিশেষ আপত্তি জানালো না তাতে, মুচকি হাসতে লাগলো।

আমি জিজ্ঞেস করলাম, টাকাটা দিয়ে কি করবি, কিছু ঠিক করেছিস?

—অনেকে পরামর্শ দিচ্ছে, ব্যাঙ্কে ফিক্সড ডিপোজিটে রাখতে। কিন্তু আমি ভাবছি···আচ্ছা, এ বাড়িটার কত দাম হবে বলতে পারিস?

—এই বাড়িটা ? না, ঠিক আইডিয়া নেই।

—তবু মোটামুটি একটা আন্দাজ কর—নীচে একটা ফ্ল্যাট আছে! আর আমাদের এটা। আমরা ভাড়া দিই সাড়ে তিনশো করে—প্রত্যেক মাসে এতগুলো টাকা বেরিয়ে যায়! তাই ভাবছিলাম এই বাড়িটাই যদি কিনে ফেলা যায়—কিন্তু বাড়িওয়ালা আশি হাজার টাকা দর হাঁকছে!

অলকা বললো, আমি বলছি এ বাড়ি কিনতে হবে না। তার চেয়ে বরং লবণ হ্রদে পাঁচ কাঠা জমি কিনে—

শৈবাল বললো, জমি কিনে নতুন বাড়ি তৈরী করা কম হাঙ্গামা নাকি? আমি অফিস থেকে ছুটি পাবো না—নিজে দেখাশুনো করতে না পারলে সবাই ঠকাবে। তার চেয়ে এ বাড়িটাই ভালো, পজিশনটাও বেশ ভালো আছে। কিন্তু আশি হাজার টাকা, টু মাচ! তুই কি বলিস?

আমি কাঁচুমাচুভাবে উত্তর দিলাম, ভাই, বাড়ির দাম সম্বন্ধে আমার কোনো আইডিয়া নেই।

—আশি হাজার যদি কিনতেই লাগে, তারপর কিছু রিপেয়ার করতেই হবে, তাতে অন্তত পাঁচ হাজার—বোনটার বিয়ের জন্য আর দেরী করা ঠিক নয়—তাতেও কম করে···

এরপর কিছুক্ষণ আলোচনা চললো, তাতে বেশ বোঝা গেল, এক লাখ টাকায় শৈবালদের বাজেট কিছুতেই কুলোচ্ছে না। কোনোক্রমে টেনে টুনে যদি এক লাখ টাকায় বাজেট করতেও পারে, তাহলে পরবর্তী দিনগুলো ওদের বেশ কষ্টে-সৃষ্টে টানাটানি করে চালাতে হবে। হাতে কিছু থাকবে না। অলকা এরই মধ্যে পাঞ্জাব ও দিল্লীর লটারির দু'খানা টিকিট কিনে ফেলেছে।

আমি জিজ্ঞেস করলাম, শৈবাল, হুগলীতে তোদের সেই দেশের বাড়িটা কি হলো?

—সেখানে আর যাই না। রাস্তাঘাট এত খারাপ যে যাওয়াই

এক ঝঞ্ঝাট। সারা বছরই বলতে গেলে থকথকে কাদা—কে যাবে সেখানে। আমার এক কাকা থাকেন—

ও বাড়ি থেকে বেরিয়ে আমি পরিতোষকে বললাম, ইস্কুলের রচনায় শৈবাল লিখেছিল যে, এক লক্ষ টাকা পেলে ও নিজের গ্রামের রাস্তা বানিয়ে দেবে। সে কথা ওর এখন একবারও মনে পড়লো না কিন্তু!

পরিতোষ বললো, কি করে রাস্তা বানাবে এখন? দেখছিস না, ওর নিজের বাজেটই এতে কুলোচ্ছে না। আমার তো মনে হচ্ছে, এক লাখ টাকা পাওয়ার ফলে বেচারীকে না না-খেয়ে থাকতে হয় শেষে!

তারপর পরিতোষ আবার বললো, যে জিনিসটা আমরা এখনো পাইনি সে সম্পর্কে অনেক কিছু কল্পনা করা যায়। যেমন ধর, পণ্ডিত নেহরু এক সময় বলেছিলেন, ক্ষমতা পেলে তিনি সব ব্ল্যাক মারকেটিয়ারদের ধরে ধরে ল্যাম্প পোস্টে ফাঁসিতে ঝোলাবেন। কিন্তু ক্ষমতা পাবার পর দেখলেন, ল্যাম্পপোস্টগুলো ঠিক মজবুত নয়, কিংবা ফাঁসির দড়ি ঠিক মতন পাওয়া যাচ্ছে না—অর্থাৎ এও সেই বাজেটে না কুলোনোর ব্যাপার।

আমি মনে মনে ভাবলুম, ভাগ্যিস আমি এখনো এক লক্ষ টাকা পাইনি। তাই দ্বীপ দেখার স্বপ্নটা আমার এখনো অম্লান আছে।

ছয়

ভদ্রলোককে দেখে আমার বারবার বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথা মনে পড়ছিল। বিভূতিভূষণ যদি এই লোকটিকে দেখতেন, তাহলে এঁর কথা খুব সুন্দর ভাবে লেখায় ফুটিয়ে তুলতে পারতেন। আমার সে ক্ষমতা নেই। বিভূতিভূষণের একটি গল্প অস্পষ্ট মনে আছে। মুদির দোকানে সামান্য কর্মচারীর কাজ করতো একজন বুড়ো লোক, দোকান টোকান বন্ধ হয়ে যাবার পর স্নান করে শুদ্ধ হয়ে একটা নিরালা জায়গায় গাছতলায় বসে বসে কবিতা লিখতো। নিজের কবিতাই আবেগে চোখ বুজে ঢুলে ঢুলে পড়তো। সেই কবিতার হয়তো কোনো মূল্য নেই, কিন্তু লোকটির অনাবিল আনন্দের দৃশ্যটি বিভূতিভূষণ অপূর্ব ভাবে ফুটিয়েছিলেন।

নীলমাধববাবু অবশ্য ওরকম দরিদ্র নন। পরিবেশ, অবস্থা সব কিছুই আলাদা।

ওঁর সঙ্গে দেখা উড়িষ্যার একটি ছোট্ট শহরে। শহর ঠিক বলা যায় না, যদিও রেল স্টেশন আছে, কিন্তু গ্রামই প্রায়। সুযোগ পেলেই মাঝে মাঝে আমি এখানে ওখানে বেরিয়ে পড়ি, সেইরকমই ঘুরতে ঘুরতে ভদ্রক-এর কাছে সেই ছোট্ট জায়গাটায় গিয়ে পড়েছিলাম। দুপুরবেলা একটা বটগাছের নীচে বাঁধানো গোল বেদীতে বসেছিলাম চুপচাপ, কিছুই করার নেই, ফেরার ট্রেন সেই সন্ধের পর। জায়গাটায় কোনো হোটেলও নেই। বাজারের কাছে গোটা দু'এক চায়ের দোকান—সেখানে থেকে দু'দিনের বাসি পাউরুটি ও আলুর দম নিয়ে মধ্যাহ্ন ভোজ সেরে নিয়েছি। যে-টুকু ঘুরে টুরে দেখার দু' এক ঘণ্টার মধ্যেই দেখা হয়ে গেছে, এখন কিছুই করার নেই, বটগাছের ছায়ায় বসে থাকা ছাড়া। স্টেশনের বেঞ্চির

চেয়ে এ জায়গাটাই ভালো, স্টেশনে বড্ড মাছি ভনভন করছিল।

মন্দ লাগছিল না বসে থাকতে, একা একটা অপরিচিত জায়গায় গাছ তলায় বসে থাকলে নিজেকে বেশ পথিক পথিক মনে হয়—যেন আমি পায়ে হেঁটে নিরুদ্দেশ যাত্রার পথে গাছের ছায়ায় দু'দণ্ড জিরিয়ে নিচ্ছি। রেল লাইনের ওপারে গোটা কয়েক শিমুল গাছ একেবারে আগুন জ্বালিয়ে দিয়েছে। কোথায় যেন অনেকক্ষণ ধরে একটা ঘুঘু ডাকছে "ঠাকুরগোপাল, ওঠো, ওঠো—" বলে ঘুঘুর ডাকে নির্জনতা অনেক বেড়ে যায়।

কুচোনো ধুতির ওপর ফতুয়া পরা, হাতে ছড়ি—একজন প্রৌঢ় যেতে যেতে থমকে দাঁড়িয়ে আমাকে দেখতে লাগলেন। বেশ কিছুক্ষণ দাঁড়িয়েই রইলেন, কোনো কথা বললেন না। আমার অস্বস্তি লাগলো, আমি চোখ অন্যদিকে ফেরালাম। খানিকটা বাদে আবার চেয়ে দেখি, তিনি তখনও তাকিয়ে আছেন আমার দিকে। এবার আমি একটু লাজুকভাবে হাসলাম। তিনি এগিয়ে এসে আমার সঙ্গে আলাপ করলেন।

—কলকাতার ছেলে মনে হচ্ছে?

—কি করে বুঝলেন?

—দেখলেই বোঝা যায়। এদিকে কি করতে আসা হয়েছিল?

—এমনিই!

—এমনিই কেউ এখানে আসে? এখানে কি কিছু দেখার আছে না কি?

মানুষ কোথায় কি দেখতে যায়—তা কারুকে বলে বোঝানো যায় না। যদি বলতাম, বটগাছের তলায় এই বাঁধানো বেদীটাই আমার দেখতে ভালো লাগছে, শুধু এটা দেখার জন্যই এখানে আসা যায়—তা হলে কি উনি বিশ্বাস করতেন? এমনি এমনি ঘুরে বেড়ানো বোধহয় অপরাধ—আমি অপরাধীর মতন মুখ করে রইলাম।

সন্ধেবেলায় ট্রেন ধরবো শুনে তিনি জোর করে আমাকে নিজের

বাড়িতে নিয়ে গেলেন। অনেকদিন তিনি কলকাতার কোনো লোকের সঙ্গে কথা বলেন নি। প্রৌঢ়ের নাম নীলমাধব সিংহ, বাড়িটা বেশ ছিমছাম পরিষ্কার—জংলা মাঠের মধ্যে দিয়ে হেঁটে গিয়ে বেশ নিরালায় সাদা একতলা বাড়ি। গেটের সামনে সাদা পাথরে লেখা আছে, 'সবার ওপরে মানুষ সত্য" !

নীলমাধব সিংহের পূর্ব পুরুষ এক সময় বাংলা দেশের লোক ছিলেন, শ খানেক বছর ধরে উড়িষ্যার ঐ ছোট্ট জায়গাটায় আছেন। নীলমাধবের পিতৃ-পিতামহ মাড়োয়ারী মহাজনদের মতন চাষীদের টাকা দাদন দিতেন, তারপর প্রচুর সুদে টাকা উসুল করে নিতেন। বংশানুক্রমিক এই ব্যবসাই ছিল, নীলমাধব ওটাকে ঘৃণিত কাজ মনে করে, নিজে ঐ পেশা পরিত্যাগ করেছেন। এখন তিনি কিছুই করেন না।

বাড়িতে দুটি মাত্র লোক, নীলমাধব আর তাঁর স্ত্রী—স্থূলাঙ্গিনী বর্ষিয়সী মহিলা—আমাকে দেখে খাতির করার জন্য এমন হাঁসফাঁস করতে লাগলেন যে আমি বিব্রত বোধ করলুম খুব। আমাকে খাওয়াবার জন্য তক্ষুনি ভাত চড়িয়ে দিলেন, কোনো আপত্তি শুনলেন না।

বাড়ির ভেতরটা ঝকঝকে, আসবারপত্রগুলো বেশ পরিচ্ছন্নভাবে সাজানো, দেখলে বোঝা যায়, এই প্রৌঢ় দম্পতির অবস্থা মোটামুটি সচ্ছল, কোনো কিছুর অভাব নেই। বাড়িতে খবরের কাগজ আসে না, নীলমাধব আমাকে জানালেন যে গত সাত-আট বছরের মধ্যে তিনি একদিনও কাগজ পড়েন নি। তবে তাঁর ছেলে একটা ব্যাটারির রেডিও পাঠিয়েছে, সেটাই তাঁর বাইরের জগতের সঙ্গে যোগাযোগের অবলম্বন।

আধ ঘণ্টার মধ্যে ওঁদের পারিবারিক ইতিহাস আমার শোনা হয়ে গেল। ওঁদের দুটি ছেলে একটি মেয়ে, সবারই বিয়ে হয়ে গেছে। একজন ছেলে দিল্লীতে চাকরি করেন, অন্যজন রাউরকেল্লায়। মেয়েটির

বিয়ে দিয়েছেন একটি ওড়িয়া ছেলের সঙ্গে, তারা থাকে ভুবনেশ্বরে। দুই ছেলে এবং মেয়ে-জামাই কত পেড়াপিড়ি করেছে ওঁদের নিয়ে যাবার জন্য, কিন্তু ওঁরা আর কোথাও যেতে চান না। শহরের হৈ-চৈ ওঁদের একদম পছন্দ হয় না—এই গ্রামের প্রতিটি পায়ে চলা রাস্তা, প্রতিটি মানুষ, প্রতিটি গাছ তাঁর চেনা—এসব ছেড়ে কোথাও যেতে চান না। এখানকার মানুষজনও ঐ দম্পতিকে খুব ভালোবাসে। নইলে মাঠের মধ্যে ফাঁকা বাড়িতে বুড়ো-বুড়ি পড়ে রয়েছে, কোনোদিন তো চুরি ডাকাতিও হয় না।

তারপরই আমি একটা বিচিত্র ব্যাপার জানতে পারলুম। কাচের আলমারিতে বেশ কিছু বই আছে, অধিকাংশ বই-ই রামায়ণ-মহাভারত জাতীয়। সময় কাটাবার জন্য সেগুলোতে চোখ বোলাচ্ছিলুম, হঠাৎ দেখলাম, আলমারির একটা তাক জুড়ে একটাই বইয়ের অনেকগুলি কপি। একখানা নিয়ে পাতা উল্টে দেখলাম, বইটির নাম "মানুষই ভগবান" লেখকের নাম 'অধম সেবক'।

আমার হাতে বইটি দেখে নীলমাধব একগাল হেসে বললেন, ও বইটা আমারই লেখা। চোদ্দ বছর আগে কটক থেকে ছাপিয়েছিলাম। জওহরলাল নেহরু, বিধান রায়, মদনমোহন মালব্য, মেঘনাদ সাহা, রাজগোপাল আচারি—সবাইকে পাঠিয়েছিলাম একখানা করে! অনেকে সার্টিফিকেট দিয়েছে। তোমাকেও একটা দিচ্ছি—

যে-বই জহওরলাল নেহরু, বিধান রায় ইত্যাদি পেয়েছেন, সে বই একখানি আমারও পাওয়া নিশ্চয়ই ভাগ্যের কথা। সেরকম কৃতার্থ মুখ করেই বইটা নিলাম। পাতাগুলো লালচে হয়ে গেছে, বড় বড় ভাঙা টাইপে চৌষট্টি পাতার বই। আগাগোড়া পদ্য। লেখা খুবই কাঁচা, ভগবান মানুষ হয়ে জন্মায় না, মানুষই আসলে ভগবান—এই কথা প্রমাণ করা হয়েছে। প্রথম আরম্ভ এই রকম:

দেহধাম জেন ভাই পুণ্য দেবালয়
পরিচ্ছন্ন রাখিলে তাহে দেবতার অধিষ্ঠান হয়…।

দু' লাইন পড়েই ভক্তিভরে বইটি পকেটে রেখে দিচ্ছিলাম। তিনি বললেন, পড়ো না, পড়ো এখনও তো খাবার দেবার দেরী আছে!

প্রৌঢ়ের উদ্‌গ্রীব চোখের সামনে আমাকে বইটির সবকটি পৃষ্ঠা পড়তে হলো। আসলে ফাঁকি দিয়েছি, সব পড়িনি—পড়া যায় না, পাতা উল্টে চোখ বুলিয়ে গেছি মাত্র। কাঁচা লেখা হোক তবু বিস্ময়কর নিশ্চিত। কয়েক পুরুষ ধরে বাংলা দেশের বাইরে আছেন. তবু বাংলা ভাষা ভুলে না গিয়ে তার চর্চা রেখেছেন তো. সেটাই বা কম কি!

নীলমাধব বললেন. আর একখানা লিখছি। তুমি শুনবে একটু? এখানার নাম দিয়েছি "নব গীতা"। দেশের এই যে দুরবস্থা, এই যে এত চাঞ্চল্য তার কারণ মানুষ এই জন্ম রহস্য. এই পৃথিবীর রহস্য ভুলে গেছে! মানুষকে এই মায়াময় জগতের কথা আবার স্মরণ করিয়ে দিতে হবে। সব কিছুই যে পূর্ব নির্দিষ্ট, মানুষ শুধু নিমিত্ত মাত্র…

প্রৌঢ়ের আশা, আর বছর পাঁচেকের মধ্যেই "নব গীতা"র রচনা তিনি শেষ করতে পারবেন। তারপর কটক কিংবা বালেশ্বর থেকে ছাপিয়ে বিলি করবেন বিনা পয়সায়। আবার পাঠাবেন ইন্দিরা গান্ধী, জ্যোতি বসু, মোরারজী দেশাই প্রভৃতিকে। এবং এই বই পড়া মাত্রই সবার মন বদলে যাবে. সব হানাহানি বিশৃঙ্খলা থেমে যাবে মানুষে মানুষে ভাই ভাই হয়ে যাবে।

ধপধপে সাদা চালের ভাত খেলাম, সঙ্গে মুগের ডাল. বেগুন ভাজা ও বাড়িতে তৈরী ঘি। নীলমাধবের স্ত্রী ভারী যত্ন করে খাওয়ালেন। তারপর খাটের ওপর শীতলপাটি বিছিয়ে দিলেন আমার বিশ্রামের জন্য। আর নীলমাধব অন্য খাটে বসে খুলে

ধরলেন চারখানি লাল খেরোর খাতা। আমাকে পড়ে শোনাতে লাগলেন তাঁর "নব গীতা"। ওঁর স্ত্রীও ভক্তিভরে শুনতে লাগলেন। আবেগে কেঁপে কেঁপে উঠছে নীলমাধবের গলা, উৎসাহে জ্বল জ্বল করছে ছানি পড়া চোখ।

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় হলে এই দৃশ্যটি কত সুন্দর লিখতে পারতেন। আমি আর কি লিখবো। আসল ব্যাপার যা হয়েছিল, শুনতে শুনতে আমার দারুণ ঘুম পেয়ে যেতে লাগলো। অথচ ঘুমিয়ে পড়াটা খুবই অভদ্রতা। আবার, খাওয়ার পর এ রকম শীতলপাটিতে বসে ঘুম আটকে রাখাও শক্ত। সিগারেট খেতে খুব ইচ্ছে করছে, কিন্তু এই রকম প্রৌঢ়-প্রৌঢ়ার সামনে চট করে পকেট থেকে সিগারেট বার করতেও কিন্তু কিন্তু লাগছে। এক একবার ঢুলুনি আসছে, আর আমি নিজের পায়ে চিমটি কাটছি। জোর করে চোখ টান করে চেয়ে থাকার চেষ্টা করছি। ঘুমটা তাড়াতেই হবে, কেন না, ঐ কবিতার ভাষা যতই দুর্বল আর পুরোনো হোক—এই এক নির্জন গ্রামে একজন প্রৌঢ় একখানি বই লিখে দেশের সব কোলাহল অনাচার থামিয়ে দেবে—এই আশা, এই দৃঢ় বিশ্বাসের দৃশ্যটি সত্যিই দেখার মতন!

সাত

দুপুরবেলা অনিমেষের অফিসে দেখা করতে গিয়েছিলাম। খানিকটা পরে মনে হল, না এলেই ভালো হতো।

অনিমেষ একটা অফিসে চাকরি করে। এক মাড়োয়ারি কোম্পানির আমদানী-রপ্তানীর শাখা অফিস। স্ট্র্যাণ্ড রোডে তিন-চারখানা ঘর নিয়ে অফিস, দশ-বারজন কর্মচারী, একজন মাড়োয়ারি বড়বাবু, অনিমেষের কাজ ইংরেজিতে চিঠিপত্র লেখা, [illegible] ও

হাফ সার্ট, শীত, গ্রীষ্ম বারোমাস অনিমেষের পায়ে কেডস জুতো— কাঁধে একটা ঝোলানো ব্যাগ, শান্ত লাজুক প্রকৃতির। ভেবেছিলুম অনিমেষের অফিসটা নিরিবিলি হবে—এই শীতের মনোরম দুপুরে কিছুক্ষণ গল্প করা যাবে। আমি দুপুরবেলা একাকীত্ব একেবারে সইতে পারি না। আর অনিমেষও, ভিড়ের মধ্যে বা অনেক বন্ধুর মধ্যে একেবারেই কথা বলতে পারে না—কিন্তু একা-একা দেখা হলে অনেক কথা বলে।

ও আমাকে দেখে উদ্ভাসিত মুখে উঠে দাঁড়িয়ে বললো, আয়, একটু বোস—আমি ততক্ষণে হাতের কাজটা সেরে নিই। তারপর—। চা খাবি তো?

চা আনতে পাঠিয়ে অনিমেষ কি একটা চিঠি শেষ করতে লাগলো। মাস দু'এক ওকে দেখিনি, আজ লক্ষ্য করলুম, ওর মুখ চোখ যেন কিছুটা শুকিয়ে গেছে। ক্রমশই শুকিয়ে যাচ্ছে—গত সাত-আট বছর ধরে দেখছি। আমারই সমান বয়েস—তবু ওর মুখের চেহারা আমার চেয়ে অনেক রুক্ষ, রেখাময়—সারা মুখের মধ্যে নাকটাই এখন বেশী প্রকট।

অনিমেষ নিজের জীবনে একজন খাঁটি ব্যর্থ-মানুষ। আমি আমার নিজের ব্যর্থতার কথা জানি না, ক্বচিৎ দৈবাৎ যদি নিজের দিকে তাকিয়ে আমি বুকের মধ্যে একটা পরিত্যক্ত পুকুরের ঘাট দেখতে পাই—সেই ভয়ে আমি একা থাকতে পারি না—ছুটে ছুটে যাই অন্য মানুষের দিকে—আমি তাদের ব্যর্থতা দেখার চেষ্টা করি। আমি অনিমেষের অনেকগুলি ব্যর্থতার কথা জানি।

ছেলেবেলায় অনিমেষ ছিল আমাদের মধ্যে পড়াশুনোয় সবচেয়ে ধারালো ছেলে, ইংরেজি পরীক্ষায় প্রতিবার ফার্স্ট হতো। আমরা ভাবতুম, অনিমেষ এক সময়ে নামকরা ইংরেজির অধ্যাপক হবে। কিন্তু, কি কারণে যেন বি. এ পরীক্ষায় ইংরেজি অনার্সে ফেল করে [illegible] অনিমেষ, আর ওর পড়াশুনো করাই হল না। মাণিকতলার

দিকে বেশ চমৎকার তিনতলা বাড়ি ছিল ওদের, ওর বাবা মারা যাবার কয়েকদিন পরই জানতে পারলুম, সে বাড়ি নাকি অনেকদিন আগেই বিক্রী হয়ে গেছে। অনিমেষরা এখন আছে বরানগরের এক নড়বড়ে ভাঙা বাড়িতে। সংসারে ছোট ভাই-বোন, মা ও বিধবা পিসি—সকলেই পাখির ছানার মতো হাঁ করে আছে, অনিমেষ সারা মাস ওদের মুখে খাবার এনে দেবে। অনিমেষ রত্না নামে একটা মেয়েকে ভালোবাসতো কলেজ জীবনে। তখন আমরা ভাবতুম, এ অত্যন্ত বিসদৃশ জোড়—অনিমেষের মতো বুদ্ধিমান ছেলের পাশে ওরকম একটা বোকা অহংকারী মেয়েকে মানায় না। রত্নার ধারণা ছিল সে সুন্দরী, কিন্তু আসলে একটা পুষি বেড়ালের মতো চেহারা। দেখা হলেই গড়গড় করে যত কথা বলতো—তার একটি কথাও না শুনলে—পৃথিবীর কিছুই যায় আসে না। অথচ অনিমেষ ছিল রত্নারই জন্য গোপন উন্মাদ। কোনোদিন রত্নাকে কিছু বলতে ভরসা পায়নি, যেদিন মুখ ফুটে বললো, সেইদিনই প্রত্যাখ্যান—তখনও অনিমেষ বাবা ও তিনতলা বাড়ি হারায়নি। রত্না ওরই সমান আর একটি বোকা—পরাশরকে বিয়ে করেছে—এবং ওরাই জীবনে সাকসেসফুল। ভারত সরকারের পররাষ্ট্র দপ্তরে চাকরি নিয়ে রত্না আর পরাশর এখন আছে সুইটসারল্যাণ্ডে। অনিমেষ আর কোনো মেয়ের দিকে চোখ তুলে তাকায়নি।

কিন্তু এ সবই তো বাইরের ব্যর্থতা। অনিমেষ তার চেয়েও বেশী হেরে গেছে। অনিমেষের চেহারায় কোনো খুঁত ছিল না—দীর্ঘ চেহারায় সুপুরুষই বলা যায়, কিন্তু ক্রমশ ও ভিড়ের যেকোনো লোক হয়ে গেল। কোনোদিন ও রুখে দাঁড়ালো না। পৃথিবীতে ও একটি দাবিও আদায় করে নিতে চেষ্টা করলো না। কোনো গণ্যমান্য লোকের সঙ্গে দিয়ে যাবার সময় আমি যদি দূরে অনিমেষকে দেখি, আমিও হয়তো ওকে পাশ কাটিয়ে এগিয়ে যাবার চেষ্টা করবো। ভিড়ের মধ্যে মিশে থেকেই হয়তো অনিমেষ একদিন অগোচরে অদৃশ্য

হয়ে যেতে চায়।

অনিমেষ বললো, আর একটু বোস, হয়ে গেছে, আমি চিঠিটা টাইপে দিয়ে আসি। ওর জামার হাতা ঢল ঢল করছে, মনে পড়লো, একসময় সৌখিন অনিমেষ সোনার বোতাম ব্যবহার করতো।···ওর অফিসঘরটা ছোট, আরও দুটো চেয়ার আছে—একটি চেয়ারে কোট রাখা, অন্যটি খালি। যাক, কিছুক্ষণ নিরিবিলিতে গল্প করা যাবে।

ফিরে এসে ও বললে, টাইপিস্ট আসেনি আজ। চিঠিটা জরুরি ছিল—তা আমি আর কি করবো!

জিজ্ঞেস করলুম, তোর বাড়ির সব কেমন আছে?

ও স্মিত হেসে বললো, ভালোই।

বুঝতে পারলুম, এই যে ভালো কথাটির সঙ্গে একটা 'ই' যোগ করে দেওয়া এবং স্মিত হাসি—এর পিছনে অন্তত আছে মায়ের বাতের ব্যথা, ছোট বোনটার জ্বর, পিসীমার চোখ অপারেশন করাতে হবে—ইত্যাদি। এগুলিরই সংক্ষিপ্ত রূপ ভালোই! আমি জানি অনিমেষ যখন মরে যাবে তখন মরার ঠিক আগের মুহূর্তে যদি ওকে জিজ্ঞেস করা হয়, কেমন আছিস, ওর যদি উত্তর দেবার ক্ষমতা থাকে তখন, তবে অনিমেষ নিশ্চিত তখনও বলবে স্মিত হাসি হেসে, এই একটু মরে যাচ্ছি আর কি!

—আবেশ, উত্তেজনা অনিমেষের জীবন থেকে একেবারে অন্তর্হিত হয়ে গেছে।

সুতরাং, কি কথা শুরু করবো? আমি তাই আলগাভাবে বললুম, তোদের অফিস থেকে গঙ্গা দেখা যায় দেখছি!

—হ্যাঁ, মাঝে মাঝে জাহাজের বাঁশীও শোনা যায়। এ বাড়ির ছাদে উঠলে দেখা যায় অনেক দূর পর্যন্ত। শীতকালের রোদ্দুরে দাঁড়িয়ে গঙ্গা দেখতে ভালো লাগে।

—চল না, ছাদেই যাই। নাকি, অসুবিধে হবে তোর

অফিসে ?

—নাঃ, অসুবিধে কি ! চল—

এই সময়ে ঘরে একটি লোক ঢুকলো। বলে দিতে হয় না, এই লোকটিই এ অফিসের মাড়োয়ারি বড়বাবু। সার্জের স্যুট হাতে সোনার ব্যাণ্ডের ঘড়ি। কিন্তু বিশাল ভুঁড়ি ও মুখে পানের দাগ—দর্পিত পদশব্দ—বড়বাবুর এই চিহ্নগুলিও আছে। লোকটির বাংলা জ্ঞান নিখুঁত। আমাকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে অনিমেষকে জিজ্ঞেস করলো, চ্যাটরজি নন ফেরাস মেটালের সেই চিঠিটা হয়েছে ?

অনিমেষ চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে বললো, হ্যাঁ।

—এখুনি পাঠিয়ে দাও !

—সেটা তো গতকালই পাঠিয়ে দিয়েছি। আপনি সই করে দিলেন—

—আমাকে এজেন্টরা ফোন করেছিল—আমি বলতে পারলুম না, আমার প্যাডে লিখে দিয়ে আসবে তো !

—আপনিই সই করলেন কিনা—

—আমার মাথায় বৃহৎ কাম ঘোরে। একটা চিঠ্‌ঠির কথা মাথায় ভরে রাখলে চলে না। প্যাড আছে কি জন্যে ? ডেপুটি কণ্ট্রোলারের চিঠিটাও হয়ে গেছে কাল ?

—না, ওটা আজ লিখেছি। কিন্তু টাইপিস্ট আসেনি।

—এবার কি কারবারটা ডকে তুলবো ? কেন আসেনি কেন ?

—আপনার কাছ থেকেই ছুটি নিয়েছে শুনলাম—

—টাইপিস্ট ছুটি নিয়েছে বলে চিঠি যাবে না ? ডেপুটি কণ্ট্রোলার সে কথা বুঝবে ?

—হাতে লিখে পাঠাবো ?

—আমাদের কারবারের কি প্রেস্টিজ নেই যে হাতে লিখে চিঠি

যাবে ? চিঠ্‌ঠিটা আজই যাওয়া দরকার।

—আমি তো টাইপ জানি না।

—টাইপ আবার জানা আর না-জানা কি। একটু সময় বেশী লাগবে। বাজে গপ্পসপ্প না করে চিঠিটা টাইপ করে ফেলুন। যদি দেরী হয়ে যায়, ওভারটাইম নিয়ে লেবেন! যান!

লোকটা আবার পায়ের শব্দ করে চলে গেল। লোকটার অসম্ভব রূঢ়তায় এবং অভদ্রতায় আমি খুবই রেগে উঠেছিলুম—কিন্তু দুনিয়ার এত মানুষের বিরুদ্ধে রেগে ওঠার আছে যে বন্ধুর অফিসের বড়বাবুর বিরুদ্ধে আর রাগ দেখিয়ে লাভ কি—এই ভেবে চুপ করে বসেছিলাম। ঐ রকম বাক্যালাপের পরই আমি চলে যাবার জন্য উঠে দাঁড়িয়েছি—অনিমেষ এ সব সহ্য করেও এখানে হাসি মুখে চাকরি করবে— কিন্তু আমার এসব সহ্য করার দরকারটা কি! কিন্তু অনিমেষ আমার হাতটা চেপে ধরে বললো, আর একটু বোস্‌।

নিজেই পাশের ঘর থেকে টাইপরাইটারটা নিয়ে এলো ঘাড়ে করে। সেটাতে কাগজ পরিয়ে টকাটক্‌ শুরু করলো। আমি এই দুপুরবেলা টকাটক্‌ শোনার জন্য আসিনি। একটু অধৈর্য হয়ে বললুম, তুই কাজ কর, আমি চলি রে!

—বোস্‌, আর এক কাপ চা খেয়ে যা।

আমার সত্যিই অস্বস্তি বোধ হতে লাগলো। অনিমেষদের অফিসে হয়তো এটা স্বাভাবিক ঘটনা। কিন্তু আমার সামনেই অপমানিত হয়ে অনিমেষ নিশ্চয়ই বেশী লজ্জিত হয়েছে। এখানে আমার না আসাই উচিত ছিল। অনিমেষের মুখ কিন্তু আগের মতই প্রশান্ত, নির্বিকার। থাকতে না পেরে বললুম, তুই জীবনে আর কত সহ্য করবি ? মানুষের কাছে এত ছোট হতে হতে তোর আর মনুষ্যত্ব কি থাকবে ?

—কার কাছে ছোট হলুম ? ঐ বাজোরিয়ার কাছে ? ওর কাছে আর অপমান হবার কি আছে ? ও তো আর বেঁচেই নেই।

—কি বল্‌ছিস্‌…

অনিমেষ টাইপরাইটার থেকে মুখ তুলে সেই রকম স্মিত হেসে বললো, সত্যি ও লোকটা আমার সামনে আর বেঁচে নেই। অনেক-দিন আগেই আমি ওর মৃত্যুদণ্ড দিয়েছি। তারপর আমিই ফাঁসি দিয়েছি ওর। চরম নির্বুদ্ধিতা এবং বুনো শুয়োরের মতো গোয়ার্তুমি দেখে আমি ঠিক করেছিলুম, ওর আর বাঁচার অধিকার নেই। অনেকদিন আগে, ও যখন আরও বাচালের মতো কথা বলছিল—আমি এই চেয়ারেই বসে থেকে বিচারকের আসনে বসে-ছিলুম, ওর ফাঁসীর হুকুম দিয়েছিলুম শান্তভাবে। তারপর, নিজেই উঠে এসে—আমিই তখন জল্লাদ সেজে ওর গলায় দড়ি পরিয়ে ওকে ঝুলিয়ে দিয়েছি। ও তখনও কথা বলে যাচ্ছিল—কিন্তু জানলো না, সেই মুহূর্তে ওর ফাঁসী হয়ে গেল। তারপর থেকে ওর কোনো কথাই আমার গায়ে লাগে না। ও তো একটা মড়া—ওর আবার কথার মূল্য কি !

আমার অবাক মুখের দিকে তাকিয়ে ও আবার বললো, তোর অবাক লাগছে ? শাস্ত্রে আছে, অতি মূর্খ এবং স্মৃতিভ্রষ্ট মৃতের সমান। দেখছিস্‌ না—আমি ওকে মেরে ফেলেছি বলে, যে চিঠি ও নিজে সই করেছে—তার কথাও ওর মনে থাকে না ! টাইপিস্টকে ছুটি দিয়ে নিজেই ভুলে গেছে—একি জীবিত মানুষের লক্ষণ ? ওর কথায় আবার রাগ করবো কি ?

— কিন্তু, তুই ওর কথা অমান্য করতেও পারিস না।

- কারণ, ওর কাছ থেকে আমি অর্থ পাই। অর্থ মৃতের হাত দিয়ে আসুক আর জীবিতের হাত দিয়ে আসুক—তার মূল্য একই। তার সঙ্গে মান-সম্মানের প্রশ্ন নেই। প্রশ্ন সেখানে—যদি আমি ওকে ভয় করতুম। কিন্তু আমি ওকে ভয় করি না--কারণ, আমি ওকে চরম শাস্তি দিয়েছি !

—তুই এই ভাবে সব মানুষকে দেখিস্‌ !

—হ্যাঁ। সেদিন ট্রামে একটা পুলিশ ভারী জুতো দিয়ে আমার পা মাড়িয়ে দিল। আমি ভেবেছিলাম, সে দুঃখিত বা লজ্জিত হবে! পাঁচ মিনিট সময় দিয়েছিলাম। কিছুই হলো না—ভ্রূক্ষেপও করলো না। তখন আমি ওর একটা পা কেটে ফেলার হুকুম দিলাম। তারপর নিজের করাত দিয়ে পুচিয়ে পুচিয়ে সেই ট্রামের মধ্যেই ওর একটা পা কেটে বাদ দিলাম। ও জানে না। এখনও ওকে দেখি মোড়ের মাথায় দাঁড়িয়ে থাকে সদর্পে, কিন্তু ও জানে না—আমার কাছে ওর একটা পা চিরকালের মতো খোঁড়া—কোনদিন আর আমাকে আঘাত করতে পারবে না। কলেজে পড়ার সময় রত্না আমাকে অন্যায়ভাবে অপমান করেছিল। আমি ওকে নির্বাসন দণ্ড দিয়েছি। কী কঠিন সেই দণ্ড!…এই তো সেদিন, আমার বাড়িওয়ালা বিষম পাজী ছিল কোনো কথায় কান দিত না। আমি তার কান দুটো কেটে নিয়েছি। লোকটা জানে না- এখনও মনের সুখে কাগজ পাকিয়ে কান চুলকোয়, কিন্তু জানে না, আমি ওর কান দুটোই কেটে নিয়েছি- সেখানে দুটো রক্তাক্ত গর্ত আমি স্পষ্ট দেখতে পাই।…

আমি স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে দেখার চেষ্টা করলুম, অনিমেষের এসব পাগলামির লক্ষণ কিনা। টাইপ মেসিনের ওপাশে—ময়লা হাফসার্ট গায় অনিমেষ একবার জোব্বা-পরচুল পরে কঠিন বিচারক হয়ে যাচ্ছে—আবার সে পর-মুহূর্তে কালো কাপড় পরে খড়্গ হাতে নিয়ে হয়ে যাচ্ছে নৃশংস জল্লাদ। কে জানে এ সব পাগলামি কিনা—কিন্তু এই খেলা নিয়ে অনিমেষ সুখেই আছে মনে হল।

আট

আগে মস্তানি, পিছে পস্তানি!

কথাটা নতুন শুনলুম, ভালোই লাগলো। যে লোকটি বললো কথাটা, তার দিকে তাকিয়ে রইলুম। খালি গা, কালো তেল চকচকে দেহ, ধুতির এক পাক কোমরে জড়িয়ে মোটা করে করে গিঁট বাঁধা। লোকটার হাতে একটা ছোট লাঠি, রাগে ফুলছে। কথাটা ও শত্রুর উদ্দেশ্যে বলছে বোঝা যায়, নিজেকে সাবধান করছে না। শত্রু অবশ্য তখন অনুপস্থিত।

আর একটা নতুন কথাও সেখানে শুনলুম। 'লাল বল্'। অনেকক্ষণ কথাটার মানে বুঝতে পারিনি। দশ বারোজন নারী পুরুষের জটলা, উত্তেজিত চিৎকার, শাসানি, তার মাঝে মাঝেই শোনা যাচ্ছে, 'লাল বলটা এই তো এখানে ছিল,' 'আমি নিজের চোখে দেখেছি লাল বলটা নিয়ে ভেগে গেল' ইত্যাদি। এতগুলো বয়স্ক লোক সত্যি সত্যিই একটা লাল বল নিয়ে বিচলিত—এটা বিশ্বাস করা যায় না। বাচ্চা ছেলের খেলার জিনিস, চুরির ঝগড়া এ নয়।

আমি ইন্দ্রনাথকে জিজ্ঞেস করলুম, লাল বলটা কি? ইন্দ্রনাথও ঐ একই ব্যাপারে চিন্তা করছিল বোধহয়, হেসে বললো, কি জানি! বুঝতে পারছি না!

মাটির দাওয়ায় চাটাইয়ের ওপর হেলান দিয়ে বসেছিলুম দুজনে। মালদা শহর থেকে আট দশ মাইল দূরে, জায়গাটার নাম পাণ্ডুয়া। সেই পাণ্ডুয়া—যেখানে রাজা গণেশের রাজধানী ছিল, রাজা গণেশের

ছেলে ইসলামে ধর্মান্তরিত হয়ে শেখ জালালুদ্দীন নাম নিয়েছিল—তার সমাধিভবন আর রাজ দরবারের ধ্বংসস্তূপ দেখতে গিয়েছিলাম। ঠা-ঠা করছে রোদ, প্রতি পাঁচ মিনিট অন্তর গলা শুকিয়ে যাচ্ছে, পিচের রাস্তা এমন চটচটে যে জুতো আটকে যায়—কোনো রকমে চক্কর মেরে আমরা ফিরে এলুম বড় রাস্তায়, এখান থেকে ফের বালুরঘাট যাবার বাস বা ট্যাক্সী ধরতে হবে। কখন তা পাওয়া যাবে ঠিক নেই।

মোড়ের মাথায় একটা ছোট চায়ের দোকান, সেখানে দু' কাপ চায়ের অর্ডার দিয়ে বাসের খোঁজ খবর নিচ্ছিলুম, চা তৈরি করছিল একজন স্ত্রীলোক, সে বললো, আহা ভাইয়েরা আপনারা রোদ্দুরে কতক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকবেন। আমার ঘরের দাওয়ায় এসে বসুন।

মাটির ঘর, তাই মেঝেটা একটু ঠাণ্ডা, সেখানে আধ-শোয়া হ'য়ে আমরা দুজনে ঘাম মুছতে মুছতে ঝগড়া শুনতে লাগলুম। এখানে সেই লাল বল নিয়ে আন্দোলন চলছে। যাক্, আমাদের পক্ষে ভালোই তো, সময় কেটে যাবে।

অবিলম্বে লাল বলের অর্থ আমরা নিজেরাই বুঝতে পারলুম। বলদকে এখানে বল বলে। কিন্তু লাল রং? লাল গরুর কথা শুনিনি। মেটে মেটে রঙের গরু হয় বটে—। অর্থাৎ মামলাটা গরু চুরির।

ভিতর দিকে মুসলমানদের প্রাচীন বসতি—অদূরে পূর্ববঙ্গ থেকে আসা উদ্বাস্তুদের কলোনি, তার উল্টো দিকে সাঁওতালদের গ্রাম। সুতরাং এলাকাটা যে তপ্ত বিছানা হয়ে থাকবে—তা তো খুবই স্বাভাবিক। আজকের ঝগড়াটা সাঁওতাল আর উদ্বাস্তুদের মধ্যে। মারামারির নিশ্চয়ই অনেক কারণ থাকে—দুপক্ষেরই গরু চুরিটা নেহাৎ ছুতো।

উদ্বাস্তুরা এখানে বিদেশী, কিন্তু পনেরো-কুড়ি বছর কেটে গেছে, অনেকটা শিকড় গেড়েছে. এখন আর সেই আগেকার মতন ভীতু

ভীতু দয়াপ্রার্থী ভাব নেই। এখন তারাও এক কাট্টা হয়ে রুখে দাঁড়ায়, পুরো অধিকার দাবি করে। সুতরাং তিন পক্ষই এখন সমান সমান—মুসলমান, উদ্বাস্তু, সাঁওতাল—এদের মধ্যে প্রায়ই ঝগড়া-লড়াই বাধে, দু'পক্ষ যখন লড়াই করে—বাকি একপক্ষ তখন চুপ করে থেকে মজা দেখে।

বেশ বুঝতে পারলুম, আজ সাঁওতাল বনাম উদ্বাস্তু একটা ঘোরতর লড়াই বাধতে আর দেরী নেই। উদ্বাস্তুদের মধ্যে একটা ছেলে, নাম তার লখা, সে শুধু চোর নয়, পুরোপুরি মস্তান। বাবলা গাছে বাঁধা ছিল সাঁওতালদের একটা গরু, সে সেটা শুধু খুলে নিয়ে যায়নি, যাবার সময় চেঁচিয়ে বলে গেছে—সাঁওতালরা আবার গরু পুষবে কি? ওরা কুকুর পুষুক! গরু আমাদের কাজে লাগবে!—কেউ একজন তাকে সাবধান করে দিয়েছিল, লখা ও গরুতে হাত দিসনি, ওটা দুখো মাঝির গরু, দুখো মাঝি তুলকালাম করবে নি! লখা নাকি তার উত্তরেও বলেছিল, যা যা! ওরকম দু'দশটা মাঝিকে হাপুর হাটে কিনে বেচতে পারি! বলিস তাকে বলদ ছাড়িয়ে আনতে—দেখবো তার কত হেম্মৎ!

লখার চরিত্রটা বেশ ইণ্টারেষ্টিং মনে হচ্ছে। এ নাটকে ভিলেন হিসেবে সে খুব জোরালো। কিন্তু মঞ্চে তাকে দেখা যাচ্ছে না। দুখো মাঝিকে দেখলাম, ভিড়ের মধ্যে সে চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে—এই ভর দুপুরেই কিছুটা নেশা করেছে মনে হয়।—চোখে রাগ কিন্তু ঠোঁটের কোণে ক্ষীণ হাসি—এইসব লোক সত্যিই বিপজ্জনক।

খানিকটা শরীর ঠাণ্ডা হয়েছে, হেলান দিয়ে বসে আমরা দুই বন্ধুতে উদ্‌গ্রীব হয়ে দেখছি। কখন মারামারি লাগবে! লাগলেই তো পারে—আমরা তাহলে দেখে যেতে পারতুম। আমরা দুজনেই মনে মনে চাইছি। মারামারিটা তাড়াতাড়ি লাগুক! প্রায়ই মারা-মারি হয়, ভবিষ্যতেও হবে এ ব্যাপারে আমাদের করণীয় কিছুই নেই—সুতরাং এই উত্তেজক দৃশ্যটা দেখার সুযোগ নষ্ট করার কোনো

মনে হয় না। সাইকেল আছে, ট্রানজিস্টার আছে, অনেকের হাতেই ঘড়ি, তবু আদিম সমাজ। জমি আর জাতিভেদ নিয়ে লড়াই অনবরত চলবে। সভ্যতা সংস্কৃতি ইত্যাদি যা সব আমরা বলি—সে সবই শহুরে ফ্যাশান।

দুখো মাঝি পিছন ফিরে দুর্বোধ্য ভাষায় কি একটা চিৎকার করে উঠলো। দূর থেকে তার উত্তর ভেসে এলো। সেদিকে আমরা তাকিয়ে দেখলাম। হ্যাঁ, এবার জমবে মনে হচ্ছে। জন পনেরো সাঁওতাল দ্রুত পায় এগিয়ে এলো, কারুর হাতে ধনুক, কারুর কাঁধে টাঙ্গি—সঙ্গে কয়েকটা শিকারী কুকুর। না সিনেমার দৃশ্যের মতন ঠিক নয়, এ সাঁওতালদের খুবই দৈন্য দৃশ্য—অধিকাংশরই চেহারা ডিগডিগে, অস্ত্রগুলো প্রথম শ্রেণীর নয়—বহুদিন শান পড়েনি। তা হোক—রিফিউজিদেরই বা স্বাস্থ্য আর অস্ত্র কত ভালো হবে? এ অঞ্চলে হাত বোমার কুটির শিল্প চালু হয়েছে কিনা ঠিক জানি না। দু'পক্ষ প্রায় সমান সমানই হবে মনে হয়।

আর একটাও নতুন শব্দ শিখলাম। খিটকেল। 'একি খিটকেল দেখুন দিদি দাদারা!' আমাদেরই বলছে। চায়ের দোকানের সেই স্ত্রীলোকটি। তিরিশের কাছাকাছি বয়েস, আঁটো স্বাস্থ্য, চোখ দুটো বেশী উজ্জ্বল—স্ত্রীলোকটিকে দেখলেই বোঝা যায়—শুধু নিজের স্বামী-কেই নয়—আশপাশের সকলকে হুকুম করার ক্ষমতা ওর আছে। একটু আগে চায়ের দোকানে ঐ রকমই তার প্রতাপ দেখেছিলাম। কিন্তু এখন সে ভয় পেয়েছে। বারান্দার বাঁশ ধরে দাঁড়িয়ে ফিসফিস করে আমাদের বললো, আমি কারুর সাতে নেই, পাঁচে নেই—আমারই দোকানের সামনে একি খিটকেল শুরু হলো।

শুধু মারামারিতেই তো নাটক হয় না—মনস্তত্ত্ব, অন্তর্দ্বন্দ্ব, নারী চরিত্র—এ-সবও তো থাকবে। এবার সেদিকটা চোখে পড়লো। স্ত্রীলোকটি খুব সংক্ষিপ্তভাবে নিজের অবস্থাটা বুঝিয়ে বললো। ওদের পরিবারটিও উদ্বাস্তু। কিন্তু স্ত্রীলোকটি নিজের বুদ্ধিতে এই উন্নতি

করেছে। কলোনিতে থেকে চাষবাস করার বদলে সেখান থেকে বেরিয়ে এসে এই চায়ের দোকান বানিয়েছে। পাণ্ডুয়াতে প্রায়ই ভ্রমণকারী আসে—সুতরাং এখানে চায়ের দোকানের উপযোগিতা সে নিজের বুদ্ধিতেই বুঝেছিল। আশেপাশে কোনো চায়ের দোকান নেই—বেশ চালু হয়েছে তার দোকান, পাশে এই মাটির বাড়িটা বানিয়েছে, পিছনে ধান জমি কিনেছে তিন বিঘে। তার দোকানে সাঁওতাল, উদ্বাস্তু, মুসলমান—সবাই চা খেতে আসে। সে নিজের হাতে চা বানায়—সবাই তাকে সুরোদিদি বলে ডাকে।

আজ লাল বলদটা চুরি হয়েছে প্রায় তারই দোকানের সামনে থেকে। সাঁওতালরা এসে তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করছে। সে এখন কি বলবে? একজনের দোষে সবার দোষ। ঐ হারামজাদা লখাটা চোর গুণ্ডা, কিন্তু দোষ পড়বে সব রিফিউজিদের নামে। লখাকে মারতে গেলে অন্য রিফিউজিরা দল বেঁধে রুখে দাঁড়াবে অর্থাৎ দাঙ্গা হবে সাঁওতাল আর রিফিউজিতে। আর একবার দাঙ্গা শুরু হয়ে গেলে—সাঁওতালরা কি তাকেও মারবে না? সেও তো আসলে রিফিউজিই। এক হয়, এখনই যদি চুপি চুপি পালিয়ে গিয়ে রিফিউজি কলোনির মধ্যে ঢুকে পড়া যায়—তাহলে হয়তো প্রাণে বাঁচবে। কিন্তু ব্যাপারটা টের পেলে সাঁওতালরা তো রাগের চোখে প্রথমেই তার দোকান-বাড়ি ভাঙবে! এত সাধের, পরিশ্রমের, কষ্টের গড়া দোকান। সাঁওতালরা এখনো তার সঙ্গে কোনো খারাপ ব্যবহার করেনি।

আর নয়তো, দোকান-প্রাণ বাঁচাবার জন্য সে যদি সাঁওতালদের পক্ষ নেয়—চেঁচিয়ে লখার নামে, রিফিউজিদের নামে গালাগালি করে চেঁচিয়ে, যদি বলে ঐ রিফিউজিদের উচিত শিক্ষাই দেওয়া উচিত—তাহলে হয়তো সাঁওতালরা খুশী হবে। কিন্তু হাজার হোক, রিফিউজিরা তার জাত ভাই—তাদের নামে ওরকম বলা যায়? আর রিফিউজিরাও কম শক্তিশালী নয়—ও-কথা শুনলে তারাও আজ না

হোক কাল এসে ঝামেলা করবে না? একি খিটকেল বলুন তো! সত্যি, 'খিটকেল' ছাড়া অন্য কোন শব্দ দিয়ে ব্যাপারটা বোঝানো যেত না!

বন্ধু ইন্দ্রনাথ বললো, থানা নেই এখানে? থানায় খবর দিন না।

সুরোদিদির বুদ্ধি কি কম, সে খেয়াল কি তার নেই? চুপি চুপি একজনকে সাইকেল দিয়ে থানায় খবর পাঠিয়েছি কিছুক্ষণ আগে। কিন্তু কারুর দেখা নেই। দাঙ্গা-হাঙ্গামা শুরু না হলে দু-একজন লোক খুন জখম না হলে—আগে কি কখনো পুলিস আসে? কেউ সে রকম দেখেছে কখনো?

সাঁওতালদের আলোচনা ক্রমশ তীব্র হচ্ছে। এবার তারা যুদ্ধে যাবেই বোঝা যাচ্ছে। একজন ডাকলো, এ সুরোদিদি, ইদিকে শোন, তু তো দেখেছিস্ উঁ শালা লখাটো···

এই সময় পথের দিগন্ত কাঁপিয়ে আমাদের বাস এলো। ইস্, মারামারিটা দেখা হোলো না! ইন্দ্রনাথকে জিজ্ঞেস করলুম, কি এই বাসটা ছেড়ে দেবে নাকি? ইন্দ্রনাথ বললো, তুমি বলো কি করবো? আমরা দুজনে কেউই মনঃস্থির করতে পারছি না। পরের বাস আবার দু ঘণ্টা বাদে। এই গরমে আরও দু ঘণ্টা কি অপেক্ষা করা ঠিক হবে? যদি শেষ পর্যন্ত মারামারি না হয়? না, আর দেরী করবো না—আমরা দুজনে ছুটে গিয়ে বাসে উঠে পড়লুম।

বাস একটু দূর যেতেই দেখলাম পথের ওপর আর একটা দঙ্গল! এখানেও কিছু লোকের হাতে লাঠি-সোঁটা। এটা রিফিউজিদের দল। পাজামার ওপর হাওয়াই সার্ট পরা ঐ লোকটাই কি লখা? ওপাশ থেকে একটা চিৎকার ভেসে আসতেই এরাও ক্রুদ্ধ চিৎকার দিয়ে উঠলো। আমরা নেমে পড়ার সুযোগ পেলুম না—বাস উর্দ্ধশ্বাসে ছুটে পালালো।

এই সব মারামারিতে পরের পরের দিন খবরের কাগজে পাঁচ-ছ লাইন খবর বেরোয় মাত্র। নিহতের সংখ্যা তিনের বেশী হলে পনেরো

কুড়ি লাইন। কিন্তু তাতে সুরোদিদির খিটকেলের কথা কিছুই থাকে না। কোনো শক্তিমান নাট্যকারের পক্ষেই শুধু ওর অন্তর্দ্বন্দ্ব ফোটানো সম্ভব। আমার সে ক্ষমতা নেই।

নয়

মেয়েদের সবচেয়ে সুন্দর লাগে, আমার চোখে, যখন তারা প্রবল বাতাসের স্রোতের বিপরীত দিকে হাঁটে। হু-হু করছে হাওয়া, চুল এলোমেলো এবং আঁচলটা পিছনের দিকে ডানার মতন উড়তে থাকে, মেয়েরা তখন বদলে যায়, তাদের চোখ মুখ অচেনা মনে হয়। সেই রকম হু-হু-করা বাতাসের মধ্যে দিয়ে পাশাপাশি হাঁটতে হাঁটতে এক পলক তাকিয়ে বরুণাকেও আমার হঠাৎ সুন্দরী মনে হলো। অন্য কোনো সময় মনে হয়নি, একটু পুরুষালি ধরনের চেহারা বরুণার, বেশ লম্বা, গায়ের রং ফর্সার কাছাকাছি হলেও রাজপুতানিদের মতন চওড়া হাতের কব্জী এবং নাকটা গুজিয়ার মতন ছোট্ট, আর বোঁচা। অন্য সময় সুন্দরী মনে হয় না, কিন্তু তখন সেই মুহূর্তে বরুণাকে মনে হলো বত্তিচেল্লির আঁকা 'থ্রি গ্রেসেস'- এর অন্যতমা। আমি বরুণার দিকে পাপ-চোখে আবার তাকালুম। কিছু একটা কথা বলা দরকার, তাই বললাম, দারুণ হাওয়া দিচ্ছে না?

বরুণা যেন অন্য জগৎ থেকে কথা বলছে, সেইভাবে উত্তর দিল, আঃ, আমার ইচ্ছে করে, সমুদ্রের ওপর একটা ছোট্ট ডিঙ্গি নিয়ে একলা এ-রকম হাওয়ার মধ্যে দিয়ে ভেসে যাই।

কথা হচ্ছিল নদীর পাড়ে। পাশেই বিশাল নিষ্প্রাণ দামোদর। ইউনেস্কোর উদ্যোগে একটা প্রোগ্রাম হয়েছিল, গ্রামের অশিক্ষিত চাষী-মজুররা কথা বলার সময় কতগুলো শব্দ ব্যবহার করে, সাধু বাংলা তারা কতখানি বোঝে এই সব তথ্য সংগ্রহ করার। কলেজের

কোনো একটা পরীক্ষার পরের ছুটিতে আমি বাই চান্স সেই চাকরি পেয়ে যাই। ন'জন ছেলে এবং পাঁচ-জন মেয়ের একটি দল মিলে আমরা গ্রামে গ্রামে ঘুরতুম, ইস্কুল বাড়িতে ক্যাম্প করা হতো। সেই দলের একটি মেয়ে বরুণা, তখন আমরা বর্ধমানের কলানবগ্রামে, শক্তিগড় অঞ্চলে। দলের আর চারটি মেয়ে আর চারশো মেয়ের মতন, তারা ছেলেদের থেকে একটু দূরে আলাদা দল মিলে থাকে, লাজুক লতার মতন আড়ে আড়ে চায়, হাসির কথায় চুপ করে থাকে, আবার অকারণে হাসে, অকারণে ভয় পায়ে, পদে পদে, "ইস কি বিশ্রী কাদা, উঃ কি বিচ্ছিরি গন্ধ···"। দলের মধ্যে যে মেয়েটি সবচেয়ে সুন্দরী ছিল—তাকে আমরা ছেলেরা আড়ালে বলতুম, মিস পুঁটুলি, শাড়ি-ব্লাউজে জড়ানো একটা পুঁটুলির মতনই দেখতে ছিল তাকে। আমাদের বিকাশ মাঝে মাঝে মন্তব্য করতো, ইস, অতই যখন লজ্জা, তখন চাকরি করতে আসা কেন?

একমাত্র বরুণা ছিল আলাদা ডাকাবুকো ধরনের, অহেতুক লজ্জার বালাই নেই, ছেলেদের সঙ্গে পাশাপাশি হাঁটছে, ছোটখাটো খানাখন্দ দেখলে দিব্যি লাফিয়ে পার হচ্ছে, কখনো বা কাদার মধ্যে হাঁটু ডুবিয়ে সাঁওতালনির মতন হি-হি করে হাসছে। বরুণা বলতো, আমি চাকরিটি নিয়েছি কেন জানেন? এই যে বাড়ির লোকজন ছাড়াই একা একা বেড়াবার সুযোগ পেলুম। বেড়াতে আমার এত ভালো লাগে।

সেই সময় আমার একটা গুরুতর অসুখ ছিল। ঘন ঘন প্রেমে পড়া। ঘণ্টায় ষাট মাইল স্পীডে কোনো গাড়ি ছুটে যাচ্ছে, তার জানলায় বসে থাকা কোনো মেয়ের মুখ দেখেও এমন প্রেমে পড়ে যেতুম যে, মনে হতো, একে না পেলে আমি বাঁচবো না! সাতদিন আহারে রুচি থাকতো না। সুতরাং বরুণার সঙ্গে যে আমি প্রেম করবার চেষ্টা করবো, তাতে আর আশ্চর্য কি! বাকি ছেলেরা অন্য চারটি মেয়ের পিছনেই ঘুরঘুর, তাদের মুখের একটু হাসি বা চোখের ঝিলিক দেখবার জন্য হা-পিত্যেশ করে বসে থাকতো। বরুণাকে

ওরা একটু ভয় ভয় করতো, তাছাড়া বরুণা বেশ লম্বা, অন্য ছেলেদের প্রায় সমান সমান দলের মধ্যে আমি একটু বেশী লম্বা ছিলুম বলে—আমার পাশেই বরুণাকে একটু একটু মানাতো। কিন্তু হায় হায়, বরুণার সঙ্গে আমার এক বিন্দুও প্রেম হলো না।

বলাই বাহুল্য, আমাদের সঙ্গে একজন প্রৌঢ় দলপতি ছিলেন—আমরা যে কাজের জন্য এসেছি সেটা সার্থক হচ্ছে কিনা দেখার বদলে—ছেলেরা-মেয়েরা সব সময় আলাদা থাকছে কিনা, এটা লক্ষ্য রাখাই ছিল যেন তাঁর প্রধান দায়িত্ব। আমরা তাঁকে গ্রাহ্য করতুম না, এবং সব থেকে অগ্রাহ্য করতো বরুণা। বরুণা অনবরত আমাদের মধ্যে চলে আসছে, খপ করে যখন তখন হাত ধরছে, ইয়াকি করে পিঠে কিল, পুকুর পাড়ে পা ধুতে গেলে গায়ে জল ছিটিয়েছে—এমনকি সন্ধের পরও এসে বলেছে, চলুন না, এ গ্রামের শ্মশানটা দেখে আসি। কিন্তু গলার স্বর একটু গাঢ় করে কথা বলতে গেলেই বরুণা চোখ পাকিয়ে বলেছে, এই, ওকি হচ্ছে, ন্যাকামি? ইস, একেবারে গদগদ দেখেছি!—না, ওরকম মেয়ের সঙ্গে প্রেমের কথা বলা যায় না, ওদের সঙ্গে শুধু বন্ধুত্ব।

বরুণার বাড়ির কথা একটু একটু শুনেছিলাম। যৌথ পরিবার, জ্যাঠামশাই বিষম আচারনিষ্ঠ, গোঁড়া, বাবা—অধিকাংশ প্রৌঢ় মধ্যবিত্ত যে-রকম হয়, কোনো বিষয়েই কোনো জোরালো মতামত নেই, মা বহুকাল হাঁপানিতে শয্যাশায়ী, দাদা কাঠের ব্যবসা ফেঁদেছে—আরও অনেকগুলো ভাইবোন। অর্থাৎ বরুণাদের বাড়িতে গিয়ে বরুণাকে দেখলে কোনো বৈশিষ্ট্যই দেখতে পেতুম না নিশ্চিত, সব মেয়ের মতনই গুটি গুটি কলেজ যায়—বাড়ি আসে, মাসী-পিসীর সঙ্গে নাইট শো-তে সিনেমা যায়, দাদার বন্ধুরা বাড়িতে এলে সে ঘরে ঢোকা বারণ। কিন্তু বাড়ির সঙ্গে খুব বোঝাবুঝির পর চাকরি নিয়েছে, আমাদের দলপতি নীতীশ-দা ওর কাকার বন্ধু—তিনি ওর ওপর নজর রাখবেন এই শর্তে। বাড়ি থেকে সেই প্রথম আলাদা

বেরিয়েছে বরুণা, তার চরিত্র আমূল বদলে গেছে, পায়ে পায়ে ওর চঞ্চলতা। বরুণার মধ্যে একটা প্রবল অ্যাডভেঞ্চারের নেশা দেখেছিলুম।

বরুণা বলতো, পৃথিবীতে কত জায়গা আছে, আমার ইচ্ছে করে একা একা ঘুরে বেড়াই! কোনো একটা অচেনা পাহাড়ের চূড়ায় উঠছি, আঃ ভাবতে যা ভালো লাগে!

আমি বলতুম, মেয়ে হয়ে শখ কত!

বরুণার চোখ ঝলসে উঠতো। তীব্র স্বরে বলতো, কেন, মেয়েরা বুঝি পারে না? ছেলেরাই সব পারে? দেখলুম তো কত ছেলে মেয়েরও অধম। দেখবেন, আমি একদিন আফ্রিকা চলে যাবো, একটা নতুন নদী কিংবা জলপ্রপাত আবিষ্কার করবো!

আমি হা-হা করে হাসতাম। বলতাম, দেখা যাবে! বড় জোর স্বামীর সঙ্গে হুড্রু জলপ্রপাত দেখতে যাওয়া কিংবা বাবা-মার সঙ্গে এলাহাবাদের ত্রিবেণী—এর বেশী না!

বরুণা তখন রাগের চোখে দুম করে আমার পিঠে এক বিরাশী-সিক্কা কিল!

আল্পস পাহাড়ের উচ্চতা মিসিসিপি নদীর দৈর্ঘ্য ওর মুখস্থ ছিল। হিটাইট সভ্যতার ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কারের ব্যাপারে একজন সুইডিস মহিলার অভিযানের কথা ও আমাকে শুনিয়েছিল। বরুণাও ছেলে-মানুষের মতন কল্পনা করতো, ও নিজেও একদিন মধ্যপ্রাচ্যে কিংবা হিমালয়ের জঙ্গলে কিছু একটা আবিষ্কার করে ফেলবে।

সেবার আমাদের দলে বরুণা সত্যিই একটা অ্যাডভেঞ্চারের সঙ্গী হয়েছিল। মরা দামোদরের পাড়ে আমরা দুপুরে এসে থেমেছি। বিষম হাওয়া দিচ্ছে, মেঘলা আকাশ। প্রত্যেকের দশজন করে চাষীকে ইন্টারভিউ করার কথা, আসবার পথে একটা বাজার দেখে তা আমরা সেরে ফেলেছি। শেষ শীতের শুকনো দামোদর—বিরাট চওড়া—কিন্তু বেশির ভাগই বালি দেখা যাচ্ছে, মাঝে মাঝে জল।

আমরা ঠিক করলুম, হেঁটে দামোদর পার হবো। বিদ্যাসাগর মশাই নাকি বর্ষার দামোদর সাঁতরে পার হয়েছিলেন, আমরা শীতের দামোদর হেঁটে রেকর্ড করবো। তখন 'আওয়ারা' বইটা সদ্য রিলিজ করেছে, আমি আর বিকাশ রাজকাপুরের ভঙ্গিতে হাঁটু পর্যন্ত প্যান্ট গুটিয়ে নিলুম। হঠাৎ বরুণা বললো, আমিও যাবো! দলপতি নীতীশ-দা আঁতকে উঠে বললেন, না, কক্ষনো না, বরুণা যাবে না। বরুণা ততক্ষণে আঁচল কোমরে বেঁধেছে, বললো, যাবোই! নীতীশ-দা বললেন না বলছি! অনেক জায়গায় কোমর এমন কি বুক জল। বরুণা বললো, তা হোক, আমি সাঁতার জানি। ঐ তো চাষীর মেয়েরাও পার হচ্ছে! নীতীশ-দা বললেন, ওরা ঠিক ঠিক জায়গা চেনে। এক এক জায়গায় দারুণ স্রোত আছে।...বরুণা, যেও না বলছি, তাহলে তোমার বাবাকে আমি নালিশ করতে বাধ্য হবো! বরুণা এবার ঠোঁট উল্টে বললো, করুন গে যান, আমার বয়ে গেল! —ততক্ষণে সে ঢালু পাড় দিয়ে নামতে শুরু করেছে!

প্রথমে বালি, বালির ওপর দিয়ে আমরা তিনজনে ছুটতে লাগলুম। বরুণার শাড়ী হাওয়ায় ফুলে উঠে পত্ পত্ করে উড়ছে। খুশীতে ওর মনখানা উদ্ভাসিত সুশ্রী। আমারও এমন ভাল লাগছিল যে, আমি ল্যাং মেরে বিকাশকে বালির ওপর ফেলে দিয়ে দুজনে গড়াগড়ি করলুম, বরুণা মুঠোমুঠো বালি আমাদের গায় ছুঁড়ে মারতে লাগলো। পাড়ে দাঁড়িয়ে বাকি সবাই দেখছে—ওরা ভদ্র, সভ্য, ওরা মাটিতে গড়াগড়ি দেবার কথা চিন্তাই করতে পারে না। একটু পরেই জলের ধারার কাছে পৌঁছলুম। ঠাণ্ডা টলটলে জল—অঞ্জলি ভরে মুখে ছিটোলাম তিনজনেই, তারপর নেমে পড়লাম। বরুণা শাড়িটা হাতে ধরে উঁচু করে নিল! ক্রমশ জল হাঁটু ছাড়ালো--তখন বরুণা শাড়িটা ছেড়ে দিয়ে বলল, ভিজুক গে।

সেই জল ছাড়িয়ে আবার বালি—ওপর থেকে বোঝা যায় না, কত চওড়া নদীর খাত। আবার বালি ছাড়িয়ে জল। এবার জল উরু

ছাড়িয়ে গেল—জল ঠেলায় সাঁ সাঁ শব্দ, বরুণা আনন্দে একেবারে খল খল করছে, একবার হোঁচট খেয়ে পড়তে গিয়ে আমার হাত চেপে ধরলো। আমি ওর কাঁধ ধরে বললাম, এবার দিই ডুবিয়ে? ও বললো, ইস্, আসুন না দেখি, আমারও গায় কম জোর নেই।

কোমর ছাড়িয়ে প্রায় বুক পর্যন্ত জল। বিকাশ বললো, জল আরও বাড়বে নাকি? বরুণা সেকথা গ্রাহ্য না করে উত্তর দিল, এত ভাল লাগছে, আমরা যেন ওপারে কি আছে জানি না, যেন একটা নতুন জায়গায় যাচ্ছি!—হাওয়া খুব জোর, জলেও স্রোতের টান লাগল, আর ব্যালান্স রাখা যাচ্ছে না, বিকাশ ভয়ে ভয়ে বললো, হঠাৎ জোয়ার টোয়ার এলো নাকি! আমি কিন্তু সাঁতার জানি না! বলতে বলতেই বিকাশ হুমড়ি খেয়ে পড়ল, আমাকে জড়িয়ে ধরে চেঁচিয়ে উঠলো, আমি বললুম, আরে ওকি করছিস! বরুণা বললো, সাঁতার জানেন না তো এলেন কেন! বিকাশ বললো চলো আমরা ফিরে যাই। বরুণা বললো মোটেই না! আমার দিকে ফিরে বললো, আপনি তো সাঁতার জানেন, আসুন আপনি আমি দুজনেই যাই। বিকাশ বললো নিলু, আমাকে আগে এ পাড়ে পৌঁছে দিয়ে যা! আমি পা রাখতে পারছি না! দু চোখ ভরা বিদ্রূপ নিয়ে বিকাশের দিকে তাকালো বরুণা। তারপর সাঁতারের ভঙ্গিতে জলে গা ভাসিয়ে দিয়ে বরুণা বলল, আমি তাহলে একাই চললুম।

চাকরিটা ছিল মাত্র তিন সপ্তাহের। শেষ হয়ে যেতে তারপর আর কেউ কারো খোঁজ রাখিনি? শুধু বিকাশের সঙ্গে মাঝে মাঝে দেখা হয়। কিছুদিন আগে বিকাশ বলছিল, তোর সেই দেবী চৌধুরাণী মার্কা মেয়েটাকে মনে আছে? বরুণা? সেদিন আমাদের এক কলিকের বাড়িতে গিয়ে দেখলুম, তার বউ সেই বরুণা। কি চেহারাই হয়েছে! চেনা যায় না—এর মধ্যেই তিনটে বাচ্চা।

তার কিছুদিন পর আমিও একদিন বরুণাকে দেখেছিলাম দুপুর-

যেনা চলন্ত ট্যাক্সিতে। টাক মাথায় আলু-আলু মার্কা একজন লোক, নিশ্চয়ই বরুণার স্বামী, মুটিয়েছে বলে বরুণার মুখখানাও ভোঁতা ধরনের, সঙ্গে একটা দেড় বছরের ছেলে খুব সম্ভবতঃ হিন্দী সিনেমায় দুর্গম পাহাড় কিংবা নির্জন হ্রদের দৃশ্য দেখতে যাচ্ছে। না চেনার কি আছে, এইটাই তো স্বাভাবিক ও সাধারণ ঘটনা !

বরুণার কথা আজ আবার মনে পড়ল, কেননা, কাগজে দেখেছিলুম আটটি বাঙালী মেয়ে হিমালয়ে উঠে রন্টি শৃঙ্গ জয় করেছে। ভাবছি এই খবরটা পড়ে বরুণা খুশী হবে, না দুঃখিত হবে ?

দশ

বাড়ি থেকে বেরিয়ে আমরা দুজনেই হেসে লুটোপুটি। এক একটা কথা আদ্ধেক উচ্চারণ করছি আর হাসির দমকে আমাদের শরীর কেঁপে কেঁপে উঠছে। রাস্তার লোক আমাদের দিকে তাকিয়ে অবাক। অমিতাভ বললো, জিনিয়াস! ওঃ, জিনিয়াসই বটে, হা-হা, হো-হো-হি-হি !

খানিকটা বাদে, একটু সামলে নিয়ে আমরা দুজনেই খুব দুঃখিত হয়ে পড়লুম। আমি দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললুম, বুঝলি অমিত, হেমন্ত-দার বাড়িতে আর আসা যাবে না।

অমিতাভ বললো, মাথা খারাপ। অন্তত পাঁচ-ছ বছর না কাটলে আমি আর এ-বাড়ির ধারে কাছে আসছি না !

হেমন্তদা কানপুরে মাস আষ্টেক ছিলেন, সেখান থেকে ফিরে এসেছেন শুনে আমি আর অমিতাভ ওঁর সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলুম। কিন্তু কানপুরে গেলে মানুষ এমন বদলে যায় ?

হেমন্তদা আমাদের ছেলেবেলার হীরো। পাড়ার ছেলেদের সঙ্গে মিশে বখে গিয়ে আমি যখন অধঃপতনের দিকে বেশ দ্রুত গড়াতে শুরু করেছিলুম, হেমন্তদা সেই সময় আমাকে উদ্ধার করলেন। হেমন্তদা তখন অ্যাপ্লায়েড সাইকলজি নিয়ে রিসার্চ করছেন, উন্নত দীপ্তিমান চেহারা, সুস্পষ্ট কণ্ঠস্বর—ভিড়ের মধ্যে থাকলেও হেমন্তদার দিকে সহজেই চোখ পড়ে। হেমন্তদা তাঁর বাড়িতে একটা স্টাডি সার্কল করেছিলেন, সেখানে আমাদের ডেকে নিলেন। হেমন্তদার সান্নিধ্যে এসে আমি মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিলাম। ইতিহাস, বিজ্ঞান, সাহিত্য—সবকিছুই হেমন্তদা কত ভালো জানেন, আর কি সরলভাবে আমাদের বুঝিয়ে বলতেন। শিশু ও কিশোরদের মনঃস্তত্ত্ব বিষয়ে হেমন্তদার নিজস্ব কতকগুলো ধারণা ছিল, সেই অনুযায়ী তিনি আমাদের বিনামূল্যে শিক্ষা দিতেন। সত্যি বলতে কি, আমি অন্তত যথেষ্ট উপকৃত হয়েছিলাম। হেমন্তদাই আমাদের শিখিয়েছিলেন, যুক্তি দিয়ে সবকিছু বিচার করবে। নিজের যুক্তি দিয়ে যা শেষ পর্যন্ত মানতে পারবে না, তা আর কারুর কথাতেই মানবে না—সে তোমার ঠাকুর্দাই বলুক, বা মাষ্টারমশাই বলুক বা হেমন্তদাই বলুক।

দু-এক বছর বাদে অবশ্য হেমন্তদার বাড়ির স্টাডি সার্কল বন্ধ হয়ে গেল, হেমন্তদা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক হলেন, কিন্তু আমরা কয়েকজন ওঁর অন্তরঙ্গ রয়ে গেলাম। হেমন্তদা বিয়ে করলেন, লতিকা-বৌদিকেও আমাদের অসম্ভব ভালো লাগতো। চেহারায় যেমন মানিয়েছে দুজনকে, তেমনি স্বভাবেও, লতিকা বৌদির ব্যবহার মধুর কিন্তু ন্যাকামি নেই। প্রায়ই সন্ধেবেলা আমরা হেমন্তদার বাড়িতে আড্ডা জমাতুম, লতিকা বৌদি কড়াইশুঁটি বেটে ডিমের সঙ্গে মিশিয়ে একরকম চপ বানাতেন, তার অপূর্ব স্বাদ, ঘন ঘন কফি কিংবা চা, এবং ততদিনে আমরা হেমন্তদার সামনে সিগারেট খেতে শুরু করেছি। অমিতাভ বেশ ভালো রসিকতা করতে পারে—পৃথিবীর

যে-কোনো বস্তুই তার রসিকতার উপলক্ষ্য হতে পারে—আড্ডার ফাঁকে ফাঁকে অমিতাভর রসিকতা শুনে হেমন্তদা আর লতিকা বৌদির বিশুদ্ধ উচ্চাহাস্য ধ্বনি এখনো আমার কানে বাজে। লতিকা বৌদির যখন সন্তান হলো, নার্সিংহোমে আমরা দেখতে গিয়েছিলাম। কি সুন্দর ফুটফুটে ছেলে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপনা ছেড়ে হেমন্তদা মিলিটারি ইনটেলিজেন্স-এর বড় চাকরি নিলেন। সেই সূত্রেই ওঁকে কানপুরে গিয়ে আট মাস থাকতে হলো। কলকাতা ছেড়ে যখন যান, তখন ওঁদের বাচ্চাটির বয়েস ন' মাস।

ফিরে আসার পর আমি আর অমিতাভ দেখা করতে গেলাম। কানপুরে হেমন্তদার বোধহয় তেমন বন্ধু জোটেনি, আড্ডা মারার সুযোগ ছিল না, অফিসের সময় ছাড়া সারাক্ষণ বাড়িতেই কাটাতেন। তার ফলে কী সাংঘাতিক পরিবর্তন।

হেমন্তদার ছেলেটির বয়েস এখন বছর দেড়েক, বেশ স্বাস্থ্যবান, কিন্তু ভয়ানক একরোখা। অমিতাভ একটু গাল টিপে আদর করতে গেছে, অমনি প্যাঁ করে শানাই-এর সুরে কেঁদে উঠলো। হেমন্তদা তাড়াতাড়ি এসে যেই কোলে তুলে নিলেন, অমনি সঙ্গে সঙ্গে। চুপ। হেমন্তদা বাথরুমে ছিলেন একটু আগে, পা-জামার দড়িটা ভালো করে আঁটেন নি, সেই অবস্থায় ছেলেকে কাঁধে করে ঘুরতে লাগলেন। আমি জিজ্ঞাসা করলুম, ছেলের কি নাম রাখলেন, হেমন্তদা? হেমন্তদা মুখ ফিরিয়ে জবাব দিলেন, নাম রেখেছি শ্রুতিধর। এমন আশ্চর্য স্মৃতিশক্তি, তোমায় কি বলবো! যে-কোনো কথা একবার শুনলেই মনে রাখে। দেখবে? বুলবুল, মুংকু, রিংকু, সোনা সোনা, বলতো সেই ছড়াটা? জ্যাক অ্যাণ্ড জিল, ওয়েন্ট আপ দি হিল! বলো, বলো? বলো মিণ্টু সোনা—

ছেলেটা গোল গোল চোখ করে একটুক্ষণ তাকিয়ে রইলো। আমরাও উদ্‌গ্রীব, দেড় বছরের ছেলে ইংরিজি ছড়া শোনাবে, এ

এক পরমাশ্চর্য ব্যাপার। ছেলে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে হঠাৎ বিনা নোটিশে আবার শানাই-এর প্যাঁ করলো। হেমন্তদা দমলেন না। একটু হেসে বললেন, থাক্, থাক্, আচ্ছা সেই বাংলাটা বলো, ওপারেতে লংকা গাছ রাঙা টুকটুক করে—এইটা বলো আজ সকালেও তো বললে, কাকু, কাকুরা এসেছেন, শোনাও, কই ?

ছেলে আবার পাঁ—অঁ্য—অঁ্য—অঁ্য—

আমার মনে হলো ছেলে শ্রুতিধর হতে পারে, কিন্তু কান্নার ব্যাপারটাই তার স্মৃতিতে প্রধান হয়ে গেঁথে আছে। অমিতাভ বললো থাক হেমন্তদা, ওর বোধহয় এখন মুড ভালো নেই। হেমন্তদা বললেন, না, না, এই তো একটু আগে হেসে হেসে কত খেলা করছিল ! আচ্ছা এইটা ছাখো।

হেমন্তদা টাইপরাইটারের ঢাকনাটা খুললেন, ছেলেকে বললেন, শ্রুতিধর বলো তো 'বি' কোনটা ? ছেলে এবার কোল থেকে ঝুঁকে খটাখট টাইপরাইটারের চার পাঁচটা চাবি টিপলো, তার মধ্যে 'বি' অক্ষরটাও আছে। আমরা বিস্ময়ে হতবাক। হেমন্তদা উদ্ভাসিত মুখে বললেন দেখলে ? আশ্চর্য না ? খোকন, বলো তো বেড়ালের ছবি কোথায় ?

ছেলে দেয়ালের দিকে বেড়াল আঁকা ক্যালেণ্ডারের দিকে আঙুল বাড়িয়ে উং গং বুম বাম লাল্লাল--এই ধরনের কি একটা বললো। আমরা বললুম, সত্যি, কি আশ্চর্য ! ভাবাই যায় না !

হেমন্তদা পরিতৃপ্তির হাসি হাসতে হাসতে বললেন ওর মামা একজন বিরাট ডাক্তার, তিনি তো বলেন, এ ছেলের মধ্যে জিনিয়াসের চিহ্ন আছে। আমি অবশ্য কথাটা হেসে উড়িয়ে দি। কিন্তু ছেলেটা এমন সব আশ্চর্য আশ্চর্য কাণ্ড করে, এই বয়সের ছেলের পক্ষে ভাবাই যায় না সত্যি ! দেখবে আর একটা ?

এরপর আমরা দেড় ঘণ্টা ছিলুম, অনবরত চলল এইসব, হেমন্তদা ছেলেকে এক একটা অসম্ভব সব ব্যাপার করে দেখাতে বলেছেন, এ

বি. সি. ডি. বলা থেকে শুরু করে ভারতনাট্যমের মুদ্রা পর্যন্ত। আর ছেলে কখনো মুখ দিয়ে দুর্বোধ্য আওয়াজ বার করছে শুধু, কখনো কেঁদে উঠেছে তারস্বরে, কখনো এটা সেটা ভাঙছে! কোমরের পায়-জামার দড়ি আলগা করে বাঁধা, কাঁধে ছেলে—হেমন্তদাকে হাস্যকর দেখাচ্ছে। ইতিহাস, বিজ্ঞান, সাহিত্য—এসব প্রসঙ্গ কোথায় অদৃশ্য হয়ে গেছে, সর্বক্ষণ শুধু ছেলের কথা। যে হেমন্তদা শিশু মনস্তত্ত্বে বিশেষজ্ঞ. যিনি আমাদের যুক্তিবাদী হতে শিখিয়েছিলেন, সেই হেমন্তদাই দেড় বছরের ছেলেকে নিয়ে এমন আদিখ্যেতা করছেন—যা দেখে যে-কোন লোকের হাসি পাবে। আমরা অতি কষ্টে হাসি চেপে বসে রইলুম।

লতিকা বৌদিরই অনেক বদল হয়েছে। আমাদের আর চপ-টপ কিছুই খাওয়ালেন না। চেহারা এবং কথাবার্তা সবই ভোঁতা হয়েছে একটু, উনিও হেমন্তদাকে তাল দিতে লাগলেন, ছেলেকে দিয়ে ছড়া বলবার চেষ্টায় নাজেহাল হলেন, ছেলের যখন কান্না ওর মুখখানাও তখন কাঁদো কাঁদো।

বাইরে বেরিয়ে অমিতাভ আর আমি প্রাণ খুলে হেসে নিলুম। দু'জনে ঠিক করলুম, ছেলেটা বেশ বড় না হওয়া পর্যন্ত আমরা আর হেমন্তদার বাড়িতে আসবো না।

সত্যিই চার-পাঁচ বছর আর যাইনি। কিন্তু এর মধ্যে অমিতাভর সঙ্গে আবার আমার ঝগড়া হয়ে গেল। প্রায় মুখ দেখাদেখিই বন্ধ। অর্পিতা ছিল আমার বান্ধবী, বেশ ব্যাপারটা জমে উঠেছিল, এক সঙ্গে সিনেমা দেখা, লেকে বেড়ানো টেড়ানো বেশ চলছিল—এই সময় অমিতাভর সঙ্গে ওর আলাপ করিয়ে দিয়েই আমি নিজের সর্বনাশ ডেকে আনলুম। অমিতাভ চমৎকার রসিকতা করতে পারে, পোষাক পরে সব সময় আধুনিকতম, চলন্ত ট্রামের জানলা দিয়ে ট্যাক্সি ডেকে নেমে পড়া ওর স্বভাব। সুতরাং আমার যা নিয়তি—সব সময় প্রতিযোগিতায় হেরে যাওয়া, ব্যর্থ হওয়া—তাই হলো, অমিতাভ

ঝপ করে অর্পিতাকে বিয়ে করে ফেললো! ব্যাপারটাকে হাসি মুখে মেনে নেবো—এতখানি স্পোর্টিং স্পিরিট সত্যিই আমার নেই। অমিতাভ, বিশেষ করে অর্পিতার ব্যবহারে আমি সত্যিই দুঃখ পেয়েছিলাম। দিনকতক আমি সিরিয়াসলি দাড়ি রাখার কথাও ভেবেছি।

কিন্তু সব দুঃখই এক সময় পুরোনো হয়ে ফিকে হয়ে যায়। হৃদয়ে সেই সব পুরোনো নাম পুরোনো দিনের কথা আর ঢেউ তোলে না। সুতরাং একটা মিউজিক কনফারেন্সে যখন আমার সঙ্গে অমিতাভ আর অর্পিতার চোখাচোখি হয়ে গেল তখন আর রক্তে ঝড় উঠল না। এবং ওরা দুজনে যখন এসে কথা বলতে এলো, আমি মুখ ফেরাতে পারলুম না। এমনকি ওদের বাড়িতে যাবার নেমতন্নও গ্রহণ করে ফেললুম।

ফিটফাট সাজানো সংসার ওদের, স্বামী-স্ত্রী আর একটি আড়াই বছরের মেয়ে। বিয়ের আগে অমিতাভর ঘরটা কি অগোছালোই থাকতো—এখন দেখলে চেনাই যায় না। আরও অনেক কিছু চেনা যায় না। মেয়ের নাম রেখেছে পূর্বা, বেশ মিষ্টি মিষ্টি কথা বলে, ঠাণ্ডা, কাঁদে না, মুখখানা অর্পিতার মতনই মিষ্টি। অমিতাভ আর আমি অনেক পুরোনো দিনের কথা ঝালিয়ে নিলুম। প্রায় চার বছর দেখা হয়নি।

কথার মাঝে মাঝে মেয়েটি এসে বাধা দিচ্ছিল। বাচ্চা ছেলে মেয়েদের কতরকম প্রশ্ন, কতরকম কৌতূহল—সেগুলোর জবাব না দিলে চলে না—সুতরাং বারবার আমাদের কথা বাধা পাচ্ছিল। নিজের মেয়ের এসব প্রশ্নে বাবারা হয়তো বিরক্ত হয় না—কিন্তু আমি আর কতক্ষণ সহ্য করবো। বুঝতে পারলুম, ঐ মেয়েকে বাদ দিয়ে কোনো কথা বলা যাবে না। অর্পিতা কয়েকবার ওকে পাশের ঘরে নিয়ে যাবার চেষ্টা করেছিল—কিন্তু মেয়ে কিছুতেই যাবে না, বাবাকে ছেড়ে সে থাকতে পারে না। সুতরাং কথার কথা হিসাবে আমি

জিজ্ঞেস করলুম, কিরে অমিত, মেয়েকে কোন্ ইস্কুলে ভর্তি করবি ?

অমিতাভ বললো, এখুনি কি, মোটে তো আড়াই বছর বয়েস ?

—বাড়িতে কিছু শেখাচ্ছিস টেখাচ্ছিস ?

অমিতাভ হো-হো করে হেসে উঠে বললো। না ভাই! ছড়া শেখানো কিংবা নাচ শেখানো—তারপর বাড়িতে লোকজন এলে জোর করে তাদের সেইসব শোনানো—এসব আমার ধাতে নেই।

আমি বললুম, বাঁচিয়েছিস!

—ছাখ ছাখ মেয়েটা কি করছে কাগজ পেন্সিল নিয়ে। একটু ফাঁক পেলেই মেয়েটা আপন মনে ছবি আঁকে!

আমি হাই তুলে বললুম, তাই তো দেখছি!

অমিতাভ বললো, আনন্দবাজারে যেসব 'আঁকা বাঁকা' বেরোয়, তার থেকে পূর্বা অনেক ভালো আঁকে! সম্পাদকের কাছে পাঠালে লুফে নেবেন।

আমি উদাসীনভাবে বললাম, পাঠালেই পারিস্!

—তুই দেখবি ওর আঁকা কয়েকটা ছবি ?

—না আমি আর দেখে কি করবো ? আমি আর্ট ক্রিটিকও নই, ছবি ছাপার ব্যাপারেও আমার বিন্দুমাত্র হাত নেই।

—সেজন্য নয়, এমনই ছাখ না—বিশ্বাসই করা যায় না, এইটুকু মেয়ে···

অর্পিতা কাছেই দাঁড়িয়ে চা তৈরী করছিল, বললো, ওর এক মামা তো বড় আর্টিস্ট, তারই ছোঁয়া লেগেছে বোধহয় মেয়েটার।

শুনেছিলাম বটে অমিতাভর এক মামা বোম্বেতে হিন্দী সিনেমার আর্ট ডিরেক্টার। তিনি হলেন গিয়ে বড় আর্টিস্ট! ঢোক গিলে আমি বললাম, বাচ্চাদের অনেক সময় আঁকিবুকি ছবি আঁকায় ঝোঁক দেখা যায় বটে—কিন্তু বড় হলে আর ওসব কিছু থাকে না!

অমিতাভ অত্যন্ত সিরিয়াস মুখ করে বললো, না রে, পূর্বার মধ্যে খুব অল্প বয়েস থেকেই ছবির দিকে একটা টান···মানে যখন ওর

মাত্র ছ'মাস বয়েস—তখন ওর দিকে একটা পুতুল আর একটা লাল রঙের পেন্সিল বাড়িয়ে দিতে দেখা গেল—ও কিছুতেই পুতুলটা নেবে না, লাল পেন্সিলটাই নেবে!

আমি স্তম্ভিতভাবে কিছুক্ষণ অমিতাভর মুখের দিকে তাকিয়ে রইলুম! তারপর বললুম, বাচ্চাদের সঙ্গে ষাঁড়ের খুব মিল আছে জানিস! ওরাও লাল রং খুব ভালবাসে। তোর মেয়ে লাল রং বলেই পেন্সিলটা ধরতে গিয়েছিল, শুধু পেন্সিল বলেই নয়!

অর্পিতা বঙ্কিম হাস্যে বললো, আপনার কথাবার্তা ঠিক আগের মতই আছে দেখছি।—অর্পিতার এই মন্তব্যের ঠিক কি মানে তা বোঝা না গেলেও এটুকু বুঝতে পারলাম ও আমার কথাটা মোটেই পছন্দ করেনি! কেন না আমার চা-এ ও চিনি দিতে ভুলে গেছে এবং অতি ট্যালটেলে বিস্বাদ লীকার।

এরপর দেড় ঘণ্টা ধরে অমিতাভ আর অর্পিতা আমাকে ওদের মেয়ের শিল্প প্রতিভা বোঝাবার চেষ্টা করল। দুটো লম্বা আর একটা গোল দাগ দেখিয়ে অর্পিতা বললো, দেখছেন কি চমৎকার মানুষ এঁকেছে—অনেকটা ওর বড় মামার মত। আর এই দেখুন এই একটা হরিণ! আরও কি আশ্চর্য দেখুন, ও কখনো পাহাড় দেখেনি—অথচ কি সুন্দর পাহাড়ের ছবি এঁকেছে। অমিতাভ বললো, পূর্বা জন্তু জানোয়ার আঁকতেও খুব ভালবাসে—পূর্বা, কাকামণিকে একটা বাঁদর কিংবা হনুমান এঁকে দেখাও তো! এই নাও পেন্সিল, নাও আঁকো।—আমি বললাম, কি রে অমিত, ও বাঁদর আঁকার জন্য তোর মুখের দিকে একদৃষ্টে চেয়ে রয়েছে কেন?—এত রসিকতাজ্ঞান ছিল অমিতের, কিন্তু তখন হাসলো না গ্রাহ্য করলোই না, বললো, আঁকো মামণি, এঁকে দেখাও।

টেকনিকটাই শুধু বদলেছে। ব্যাপারটা সেই একই আছে। দেড় ঘণ্টায় আমি ক্লান্ত বিরক্ত, গলদঘর্ম হয়ে উঠলাম। বাইরে বেরিয়ে মনে পড়লো হেমন্তদার বাড়ি থেকে বেরিয়ে আমি আজ

অর্পিত কী রকম হেসেছিলাম। আজ অমিতের বাড়ি থেকে বেরিয়ে আমি হাসতেই পারছি না।

সেদিন আমার দুটি বিষয়ে উপলব্ধি হলো, এক অর্পিতাকে বিয়ে না করে আমি খুব জোর বেঁচে গেছি। আর দ্বিতীয়ত, বিয়ে করলেই যদি বাবা হতে হয়—এবং বাবা হলেই যদি হেমন্তদা কিংবা অমিতাভর মতন বোকা হয়ে যেতে হয়—তবে ইহজীবনে আমি সংসারধর্ম কিছুতেই গ্রহণ করছি না।

এগারো

আমি আর আমার বন্ধু চৌরঙ্গীর মোড়ে দাঁড়িয়ে আছি, উত্তর কি দক্ষিণ কোন দিকে যাবো মনঃস্থির করতে পাচ্ছি না—সেই সময় একজন মহিলা রাস্তা পার হয়ে আমাদের পাশ দিয়ে যেতে যেতে তপনকে দেখে মৃদু হেসে বললেন, কি খবর তপন? তপন তখন পথের অন্য মহিলাদের দেখায় ব্যস্ত ছিল, তাড়াতাড়ি ঘাড় ঘুরিয়ে বললো, আরেঃ, রেবাদি? কেমন আছেন?

মহিলাটি বললেন, ভালো আছি। তারপর আবার তিনি বললেন, খুব ভাল আছি। রিজেন্ট পার্কে একটি চমৎকার ফ্ল্যাট পেয়েছি। তোমার বৌদিকে একদিন আসতে বলো—

তপন বললো, বৌদি তো এখন দিল্লীতে—

আমি একটু সরে অন্য দিকে দূরে দাঁড়ালাম। তপন মহিলার সঙ্গে কথা বলতে লাগলো। মহিলাটির বয়েস তিরিশ-পঁয়তিরিশের মধ্যে, বেশ সুন্দরী স্বাস্থ্য, হাল্কা গোলাপি রঙা শাড়ি পরেছেন। সবচেয়ে নজরে পড়ে, ওঁর কপালে আগেকার তামার পয়সার সাইজের সিঁদুরের টিপ। হ্যাণ্ডব্যাগটি বেশ বড়, তার মধ্য থেকে একটা বাচ্চাদের খেলার এরোপ্লেন উঁকি মারছে।

দু-তিন মিনিট তপনের সঙ্গে গল্প করে মহিলা একটি লেডিজ ট্রাম দেখতে পেয়ে তাড়াতাড়ি উঠে পড়লেন। তপন আমাকে জিজ্ঞেস করলো, তাহলে কোন দিকে যাওয়া যায়?

আমি কোনো উত্তর দিলুম না।

তপন বললো, তুই রেবাদি-কে আগে দেখিস নি?

—না।

—বৌদির খুব বন্ধু। আগে আমাদের বাড়িতে খুব আসতেন—

—না দেখিনি।

লাল আলোর সামনে ট্রামটি তখনও দাঁড়িয়ে। ট্রাম ভর্তি নানা রঙের মহিলা—সেদিকে তাকিয়ে থাকা যায় না। ট্রাম বা বাসের জানলার একটি দুটি মহিলাদের দেখে অনেক সময় বহুক্ষণ সতৃষ্ণ নয়নে তাকিয়ে থাকতে ইচ্ছে করে, কিন্তু পুরো গাড়িটাই মহিলাতে ভর্তি, লেডিজ ট্রামের দিকে দু-এক পলকের বেশী চোখ রাখতে গেলেই লজ্জা লাগে।

তপনের বৌদির বন্ধু জানলার পাশেই বসে ছিলেন ট্রাম ছাড়তে তপন আবার সেদিকে চেয়ে হাসিমুখে হাত নাড়লো। তারপর তপন আবার আমাকে বললো, রেবাদিকে জিজ্ঞেস করলুম, কেমন আছেন? উনি বললেন, ভালো আছি। বলতে পারিস্ 'ভালো' কথাটার কত রকম মানে হয়, আমি ঠোঁট উল্টে বললুম, কে জানে!

—রেবাদিকে দেখে তোর কি মনে হয়।

—কি আবার মনে হবে? আমি তো ভালো করে দেখিই নি?

—যা দেখেছিস তাই যথেষ্ট। ঐটুকু দেখে রেবাদি সম্পর্কে তোর কি ধারণা হলো বলতো! দেখি, তোর অবজারভেশনের ক্ষমতা কি রকম! রেবাদি দুবার বলেছেন, 'ভালো আছি', সেটা খেয়াল রাখিস্!

—ভদ্রমহিলা চাকরি করেন, সম্প্রতি বোধ হয় প্রমোশন হয়েছে, তাই অত খুশী খুশী মুখ। ক'টি সন্তান তা বলতে পারবো না, তবে

একটি ছেলে আছেই—মেয়ে থাকলে এরোপ্লেন না কিনে পুতুল কিনতেন, উচ্চারণ শুনে মনে হল ভদ্রমহিলা বি-এ পাশ, খুব সম্ভবত সংস্কৃত কিংবা ফিলজফিতে অনার্স ছিল। ভদ্রমহিলার স্বামী ইঞ্জিনীয়ার—না, না সরকারী কর্মচারী, একটু কুঁড়ে—তবে খুব পত্নী অনুগত, ভদ্রমহিলার শাশুড়ীও এক সঙ্গে থাকেন—শাশুড়ী-বউ-এর মধ্যে ঝগড়ার বদলে কে কতটা ভালো ব্যবহার করতে পারে—তার প্রতিযোগিতা চলে, ভদ্রমহিলার সখ বেড়াল পোষার—কিন্তু স্বামীর ইচ্ছে কুকুর, ইনস্টলমেণ্টে রেফ্রিজারেটার কিনবেন প্রায় ঠিক করে ফেলেছেন—

তপন হো হো করে হেসে উঠে বললো, তুই আজকাল শখের গোয়েন্দাগিরি করছিস নাকি ?

আমি ঈষৎ গর্বের সুরে বললুম, কি সব মেলে নি ? অন্তত সেভেন্টি ফাইভ পারসেণ্ট।

—তুই কি করে জানলি ?

—মানুষ দেখে স্টাডি করার অভ্যেস করতে হয় !

তপন পুনশ্চ হাসতে হাসতে বললো, খুব মানুষ চিনেছিস্। একটাও মেলেনি ! ঐ যে রেবাদি পর পর দুবার ভালো আছি বললেন, সেটা লক্ষ্যই করিস নি। কেউ যখন প্রশ্নের উত্তরে শুধু এক বার বলে ভালো আছি, তাহলে হয়তো সে সত্যি ভালো নাও থাকতে পারে—সবাই তো আর দুঃখের গল্প সব সময় শোনাতে চায় না। কিন্তু দুবার 'ভালো আছি' বললে বুঝবি পিছনে অনেক কিছু আছে, সুখ দুঃখের একটা জটিল ইতিহাস, তার মধ্যে কোন্‌টা বেশী কোন্‌টা কম—সে বিষয়ে মনঃস্থির করা যায় না। মানুষ কত রকমে ভালো থাকে জানিস ? তোরা সব সময়ে মানুষকে ছকে ফেলতে চাস্। কিন্তু প্রত্যেকটা মানুষ আলাদা। রেবাদির জীবনের গল্প শুনলে স্তম্ভিত হয়ে যাবি। শুনবি ?

রেস্টুরেণ্টে চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে তপন বললো, রেবাদি আমার

বৌদির সঙ্গে বরাবর স্কুল-কলেজে এক সঙ্গে পড়েছেন, আমাদের বাড়িতে খুব আসতেন। বৌদি চেষ্টা করেছিলেন, রেবাদির সঙ্গে চানুদার বিয়ের ব্যবস্থা করতে (চানুদাকে চিনিস তো ? দাদার বন্ধু, দুর্গাপুরে···।) চানুদার পছন্দও হয়েছিল রেবাদিকে, কিন্তু সেই সময় রেবাদি হঠাৎ একটা প্রেম করে ফেললেন। রেবাদি নিউসেক্রেটারিয়েটে চাকরি করেন—একদিন বৃষ্টির দিনে এক ভদ্রলোক ওঁকে ট্যাক্সি করে বাড়ি পৌঁছে দিতে চাইলেন, সেই থেকে আলাপ আর প্রেম, দু' মাসের মধ্যে ভদ্রলোকের সঙ্গে রেজিস্ট্রি করে বিয়ে হয়ে গেল। রেবাদির স্বামীকে দেখতে খুব সুপুরুষ, চানুদার চেয়ে অনেক ভালো ঠিকই, কিন্তু বৌদি তবু দুঃখিত হলেন। চানুদা কত বড় চাকরি করেন, আর কি ভালো মানুষ—তার তুলনায় প্রায় একটা অচেনা-অজানা লোককে বিয়ে করা—কিন্তু প্রেম ইজ প্রেম—কে আর কি বলবে। বিয়ের পর রেবাদি আমাদের বাড়িতে আসা কমিয়ে দিলেন। একদিন আমার সঙ্গে ডালহৌসিতে দেখা—রেবাদির একগাদা গয়না গায়—দামী শাড়ি, সেদিনও আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম, রেবাদি কেমন আছেন ? রেবাদি হাসি হাসি মুখে বলেছিলেন, ভালো আছি ভাই (একবারই ভালো আছি বলেছিলেন, সেদিন দুবার নয়) তোমার বৌদিকে বলো যাবো একদিন—একদম সময়ই পাচ্ছি না—

বৌদি বলতেন, রেবা একেবারে বিয়ে করে গদগদ—ওর স্বামী নাকি ওকে ছাড়া এক মুহূর্ত থাকতে পারে না সব সময় মাথায় করে রেখেছে—রেবা বাপের বাড়ী যাবারও সময় পায় না।

তপন সিগারেট ধরিয়ে বলল, এরপর পর পর চমকাবার জন্য তৈরি থাক। রেবাদির জীবনের সত্যি ঘটনাগুলোই এমন অবিশ্বাস্য যে একটুও বানাতে হয় না।···কিছুদিন পরে রেবাদিকে দেখলাম আবার আমাদের বাড়িতে আসছেন, বৌদির সঙ্গে দরজা বন্ধ করে অনেকক্ষণ কথা বলছেন, খুব মুখ শুকনো ! বৌদি তখন আমাদের

কিছু বলেন নি, তারপর কোর্টে মামলা ওঠার পর জানতে পারলুম—

—কোর্টে ?

—হ্যাঁ, ঘটনাটা এই রেবাদির বিয়ের আট ন-মাস পর একদিন একজন অপরিচিত মহিলা ওঁকে টেলিফোন করেন। তিনি বলেন যে, তিনি অনেক কষ্টে রেবাদির অফিসের ঠিকানা জোগাড় করেছেন, রেবাদির সঙ্গে তার দেখা করার বিশেষ দরকার—রেবাদিরই উপকারের জন্য। দেখা করে ভদ্রমহিলা বললেন, তিনি রেবাদির স্বামীর প্রথম পক্ষের স্ত্রী। রেবাদির স্বামী একজন অত্যন্ত লম্পট এবং বদমাইস লোক। রেবাদির সাবধান হওয়া উচিত। রেবাদি বিশ্বাস করলেন না। তিনি জোর দিয়ে বললেন, না, তাঁর স্বামী খুব ভালো লোক, তাঁর সঙ্গে ভালো ব্যবহার করেন—ভদ্রমহিলার কথার প্রমাণ কি? ভদ্রমহিলা কি চান ?

ভদ্রমহিলা বললেন, তিনি কিছুই চান না। কিন্তু রেবাদির স্বামী ভালো ব্যবহার করেন—এটা তাঁর কাছে অবিশ্বাস্য মনে হচ্ছে। লোকটি কি সত্যিই তাহলে বদলে গেছে ? লোকটি কি দাড়ি কামাবার আগে খুর ধার দেবার জন্য স্ত্রীর পিঠে খুর ঘষে রসিকতা করে না ? লোকটি কি সারারাত বন্ধু বান্ধবদের নিয়ে বাড়ীতে মদ খেয়ে হল্লা করার জন্য স্ত্রীকে রান্না ঘরে শুতে বাধ্য করে না ? লোকটি কি স্ত্রীর টাকা নিয়ে মাঝে মাঝেই চার-পাঁচ দিনের জন্য বাড়ি থেকে অনুপস্থিত থাকে না ? লোকটি কি চাবুক দিয়ে কোনদিন···

ভদ্রমহিলা রেবাদির হাত চেপে ধরে বললেন, আপনি বলুন সে ভালো হয়ে গেছে, তাহলেই আমি খুশী হব। আমি আর কিছু চাই না, আমার কোনো স্বার্থ নেই। ওর সঙ্গে আমার কোন সম্পর্কই নেই —এক বছর আগে ওর সঙ্গে আমার সেপারেশন হয়ে গেছে।

রেবাদি তখন আর কি করবেন। ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে

কাঁদতে মেঝেতে শুয়ে পড়লেন, তারপর অজ্ঞান হয়ে গেলেন। প্রত্যেকটি কথাই সত্যি। বিয়ের একমাস পর থেকেই লোকটি ওর থেকেও আরও ঢের বেশী অত্যাচার করছে। রেবাদি একথা কারুকে বলতে পারেন না—কারণ তিনি নিজেই জোর করে বিয়ে করেছেন—সেইজন্য তিনি বাইরে হাসি-খুশী থাকতেন। সবার সামনে নিজেকে সুখী দেখাতে চাইতেন।

তপনের গল্প শুনতে শুনতে আমার মনে পড়লো, ভদ্রমহিলার মুখ। বেশ উৎফুল্ল মুখে তিনি বলেছিলেন, ভালো আছি। সেটা সবটাই অভিনয়? তাহলে তো তিনি কাননবালা কিংবা ইনগ্রিড বার্গমানের চেয়েও বড় অভিনেত্রী। না সবটাই অভিনয় হতে পারে না! কিন্তু দু'বার বলেছিলেন—সে বোধহয় অন্যরকম ভালো থাকা। তপনকে জিজ্ঞেস করলুম, রেবাদি তখন কোর্টে মামলা করলেন?

তপন বললো, শোন্ না! জনপ্রিয় ঔপন্যাসিকরা নভেলে যত স্টাণ্ট দেন—অনেক সত্যি ঘটনায় তার চেয়ে অনেক বেশী চমক থাকে। অদ্ভুত ধরনের সামজিক গণ্ডগোল শুধু বিলেত-আমেরিকাতেই হয় না—কলকাতাতেও অহরহ ঘটছে। রেবাদি কোর্টে কেস করতে বাধ্য—কারণ লিগাল সেপারেশানের পর দু' বছরের মধ্যে বিয়ে করা এদেশে বেআইনি। লোকটা তাই করেছে। কোর্টেও জজ রায় দিলেন বিয়েটা সম্পূর্ণ অসিদ্ধ। আইনত, লোকটির সঙ্গে রেবাদির যে বিয়ে হয়েছে—সেটা মানা হবে না। কিন্তু—

তপন আমার চোখে চোখ রেখে বললো, কিন্তু রেবাদি তখন পাঁচ মাসের প্রেগনেণ্ট। সেই অজাত শিশুটির জন্য আদালত থেকে কোনো নির্দেশই দেওয়া হলো না। তাহলে সেই সন্তানটির পিতৃপরিচয় কি হবে? এই অবস্থায় যা স্বাভাবিক সবাই সেই পরামর্শটি দিয়েছিল রেবাদিকে, কিন্তু রেবাদি তা কিছুতেই মানতে

চাইলেন না। তোর একটা অনুমান ঠিক, রেবাদির মেয়ে হয়নি, ছেলেই হয়েছে, রেবাদির ছেলের বয়স এখন চার বছর—ভারী সুন্দর ছেলেটা। কিন্তু এরপর তোকে যা বলবো, শুনলে তোর সত্যিই অবিশ্বাস্য মনে হবে, ভাববি হয়তো রূপকথা কিংবা আরব্যোপন্যাস—কিন্তু এর প্রতিটি বর্ণ সত্যি। আমি নিজে সাক্ষী আছি, আমি রেবাদির ছেলের অন্নপ্রাশনে নেমতন্ন খেতে গিয়েছিলাম। বিরাট ধুমধাম করে অন্নপ্রাশন হয়েছিল—

রেবাদির স্বামীর সেই প্রথম পক্ষের স্ত্রী, তাঁর নাম অনুসূয়া, তিনি কিন্তু ঐ লোকটিকে প্রেম করে বিয়ে করেন নি। তাঁর বাবা দেখেশুনেই—অমন চমৎকার চেহারার ছেলে, তখন ইনকামট্যাক্স অফিসে ভালো চাকরিও করতো—ঘুষ নিতে গিয়ে ধরা পড়ে চাকরি গেছে—বেশ জাঁকজমক করে বিয়ে দিয়েছিলেন। অতিকষ্টে পাঁচ বছর অনুসূয়াদি থাকতে পেরেছিলেন স্বামীর সঙ্গে—তারপর তাঁর মনও শরীর দুই-ই ভেঙে পড়ে। রেবাদির ছেলে হবার পর তিনি হঠাৎ এসে একদিন বললেন, তোমার ছেলেকে আমায় দিয়ে দাও, আমি ওকে নিয়েই থাকবো। তোমার তো বয়েস কম—তোমার হয়তো আবার কারুর সঙ্গে ভাব টাব হতে পারে—কিন্তু আমার জীবনে আর কিছুই নেই, আমি ঐ ছেলেটাকে নিয়ে তবু বাঁচতে পারি। রেবাদি ছেলেকে একেবারে দিয়ে দিতে কিছুতেই রাজী নন। অনেক লজ্জা অপমান সত্ত্বেও তিনি ছেলেকে পৃথিবীতে এনেছেন। সুতরাং একটা অন্য ব্যবস্থা হোল। অনুসূয়াদি বেশ বড়লোকের মেয়ে, কিন্তু তিনি বাড়ি ছেড়ে রেবাদির সঙ্গে একসঙ্গে থাকেন এখন—ছেলেকে সব সময় দেখতে পাবার জন্য। আমি ওঁদের, বাড়িতে গিয়েছিলাম—অনুসূয়াদি আর রেবাদি অবিকল দু-বোন কিংবা দুই সখীর মত চমৎকার মিলেমিশে আছেন—খুব ভাব ওঁদের, কখনো মতের অমিল হয় না অনুসূয়াদি তাঁর বাড়ি থেকে মাসে আড়াইশো টাকা পান--রেবাদি চাকরি করেন—সুতরাং বেশ

সচ্ছল ওঁদের—ছেলেটির যদিও পিতৃ-পরিচয় নেই—কিন্তু তাকে ওঁরা রাজপুত্রের মতন যত্নে রেখেছেন। রেবাদি সধবা সেজে থাকেন—লোকে জানে ওঁর স্বামী বিদেশে আছে। এখন ওঁরা যে-ভাবে আছেন তাকেও সব মিলিয়ে বেশ ভালো থাকাই বলে—তবে দুবার 'ভালো-আছি' বলার মতন ভালো থাকা, তাই না?

বারো

এই সময়টায় ওদের দেখলেই চেনা যায়. বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ, আষাঢ়, শ্রাবণ এই চার মাসে বাংলা দেশের হাজার হাজার মেয়ের বিয়ে হয়ে গেল, এখন এই শরৎকালে তাদের দেখলেই বোঝা যাবে—তারা অন্য সব মেয়ের চেয়ে আলাদ। তারা আর কুমারী নয়, তারা এখনও গিন্নী নয়, তারা নতুন বউ। তাদের পা এখন পৃথিবীর মাটি ছোঁয় কি ছোঁয় না।

তাদের মাথায় সিঁথির সিঁদুর বড় বেশী গাঢ়, অনভ্যস্ত হাতে সিঁথি ছড়িয়ে চুলের মধ্যেও ছড়ানো সিঁদুরের গুঁড়ো—সেই সঙ্গে মুখেও একটা অরুণ আভা সব সময়। হাতের সোনার গয়না অন্যদের চেয়ে বেশী ঝকঝকে, এখন প্রত্যেকদিন তারা এক একটা নতুন শাড়ী পরে রাস্তায় বেরোয়, পায়ের চটি জোড়াও নতুন, ব্লাউজ নতুন! অর্থাৎ নতুন বউদের সবই নতুন। গায়ের চামড়াও নতুন রং ধরেছে মনে হয়, ঠোঁটে নতুন রকমের হাসি, পাশের নতুন লোকটির দিকে মাঝে মাঝে চোরা চাহনি—এইসব মিলিয়ে ওদের আলাদা করে চেনা যায়।

এই লগনশা'য় আমার চেনা পাঁচটি মেয়ের বিয়ে হয়ে গেল। দু'জন নেমন্তন্ন করেছিল, আর তিনজন ভুলে মেরে দিয়েছিল। তা নেমন্তন্ন করুক আর না করুক, প্রত্যেকের বিয়ের দিনই আমি বিষণ্ন

বোধ করেছি। সত্যিকথা বলতে কি, পৃথিবীর যাবতীয় কুমারী মেয়ের বিবাহ সংবাদেই আমি ব্যক্তিগত ক্ষতি অনুভব করি। যেমন, পৃথিবীতে তো প্রতিদিন অসংখ্য শিশু থেকে বৃদ্ধ ব্যক্তির মৃত্যু হচ্ছে, কিন্তু কোনো কুমারী মেয়ের মৃত্যুর কথা শুনলে আমি আমার বুকে দারুণ শেলের আঘাত পাই। মনে হয়, পৃথিবীর পক্ষে এ ক্ষতি অপূরণীয়।

যাই হোক, যে পাঁচজনের বিয়ে হয়ে গেল, তাদের মধ্যে দুজন বিয়ের পরই চলে গেল কলকাতার বাইরে, একজন শিলং আর অন্যজন মাদ্রাজ—সুতরাং আমার চোখে তাদের কুমারী জীবনের ছবিই জেগে রইলো। বাকি তিনজনের মধ্যে রত্নার বিয়ে হয়েছে এক বনেদী পরিবারে—তার সঙ্গে দেখা হবার সম্ভবনা কম। দেখা করার জন্য আমি যে খুব উদগ্রীব—তাও তো নয়, আমি তো আর এক সঙ্গেই সব কুমারীর ব্যর্থ প্রেমিক হতে পারি না। ওরা কেউ আমার প্রেমিকা ছিল না, কিংবা আমাকে প্রেমিক হবার সুযোগ দেয়নি, তবু ওদের বিবাহ-জনিত আমার যে বিষণ্ণতা, সেটা একটা অন্যরকম ব্যাপার—আমি তার ব্যাখ্যা করতে পারবো না।

স্নিগ্ধার সঙ্গে দু'বার দেখা হলো এর মধ্যে। স্নিগ্ধার বরটি বেশ নাদুসনুদুস, মুখে একটা বিগলিত হাসি, তার পাশে স্নিগ্ধা যেন হাওয়ায় উড়ছে। চাঁপা রঙের বেনারসীর আঁচল হাওয়া থেকে ফিরিয়ে আনতে আনতে স্নিগ্ধা হঠাৎ আমাকে দেখতে পেয়ে অযাচিত-ভাবে উচ্ছল হয়ে বললো, আরে আপনি? কি খবর? বিয়েতে আসেন নি কেন?

স্নিগ্ধা ভুলে গেছে যে ও আমাকে নেমন্তন্নই করেনি, কিন্তু সেকথা তো মনে করিয়ে দিতে পারি না এখন। তাই আমাকে লাজুক মুখে বলতে হলো, না, ইয়ে খুব দুঃখিত খুব যাবার ইচ্ছে ছিল, কিন্তু একটা বিশেষ কাজ—

স্নিগ্ধা তার বরের দিকে ফিরে বললে, ঐ যে টুটু মাসী, টুটু মাসীকে

মনে আছে তো? যিনি সেই বৌভাতের দিনে একটা কই মাছ পাড় শান্তিপুরী শাড়ী পরে এসেছিলেন, সেই যে আসানসোলে ওঁর বাড়িতে যাবার জন্য আমাদের নেমন্তন্ন করেছেন—তার দেওরের ছেলে নীলুদা, আমাদের সঙ্গে একবার থিয়েটার করেছিলেন। নীলুদা আসবেন একদিন আমাদের বাড়িতে, নিউ আলিপুরের ও ব্লক, এ সপ্তাহে না, সামনের মাসে একদিন—আমরা হায়দারাবাদে হনিমুনে যাচ্ছি (এই সময় একটু মুচকি হাসি)—ফিরে এলে তারপর,—

স্নিগ্ধার কি বদল হয়েছে এই ক'দিনে! আগে স্নিগ্ধা ছিল খুব শান্ত ধরনের মেয়ে, বেশী কথা বলতো না, কখনো জোরে শব্দ করে হাসেনি—বিয়ের এক মাসের মধ্যেই স্নিগ্ধা অজস্র কথায় উচ্ছ্বসিত। একাই সব কিছু বলে যাচ্ছে, হায়দারাবাদে হনিমুনের কথা, নিউ আলিপুরে ওদের ফ্ল্যাট কত সুন্দর, 'ওর' অফিস থেকে শিগগিরই গাড়ি দিচ্ছে—স্নিগ্ধা যেন তার গয়নার ঐশ্বর্য এবং শাড়ীর জৌলুষের সঙ্গে সঙ্গে কায়দা আমাকে দেখিয়ে, ছ্যাখো, আমার স্বামীও কত ভালো লোক—তোমার মতন একটা রোগা আর কালো চেহারার বাউণ্ডুলের তুলনায় আমার স্বামী কিরকম রূপবান দেবতা।

আশ্চর্য মেয়েদের মনস্তত্ত্ব। আমি কি কোনোদিন স্নিগ্ধার পানি-প্রার্থী ছিলাম? কক্ষনো না! তাহলে আমার কাছে ওর এত স্বামী-গর্ব করে কি লাভ? ও বুঝি হিংসেয় আমার বুক ফাটিয়ে আনন্দ পেতে চায়? কিন্তু এই ফাটা বুক আর কত ফাটবে?

পূরবী আবার অন্যরকম। পূরবীর একটু একটু দুর্বলতা ছিল আমার সম্বন্ধে। আমিও তাতে খানিকটা প্রশ্রয় দিয়েছি। কোনো কোনো নম্র গোধূলিতে বারান্দার রেলিংয়ে হেলান দিয়ে পূরবী আর আমি মৃদু স্বরে কথা বলেছি। শুধু কথাই, তাঁর বেশী আর এগোয়নি। যে সব স্থান পূরবীর ভালো লাগতো, সেগুলো আমার প্রিয়। হাজারীবাগের ক্যানারি হিল থেকে দেখা সূর্যাস্ত আমার ভালো লেগেছিল, পূরবীর সঙ্গে তো মিলে গেল। কোথাও ভিড়ের মধ্যে

আমাকে দেখলে পূরবী এগিয়ে এসে আমার সঙ্গে কথা বলতো, কখনো হাত ধরে টেনে নিয়ে যেতো ভিড় থেকে আড়ালে। তবে শুধু বা ঐটুকুই, তার বেশী না।

সেই রকমই এক নম্র গোধূলিতে পূরবীর সঙ্গে আমার দেখা হলো রাসবিহারীর মোড়ে। বিয়ের পর পূরবীকে এই প্রথম দেখলাম। সিঁদুরের আভায় তার মুখখানি আরও সুন্দর দেখাচ্ছে। পূরবীর স্বামী ছিল না, পাশে যে মেয়েটি—সে বোধহয় তার ননদ বা ঐরকম কিছু, আমার সঙ্গে চোখাচোখি হলো পূরবীর—সঙ্গে সঙ্গে চোখ ফিরিয়ে নিল—একটা কথাও বললো না, না-চেনার ভঙ্গিতে চলে গেল। আমি আমার ঠোঁটের উদ্যত কথা ফিরিয়ে নিলাম। আমি পূরবীকে অভিনন্দন জানাতে যাচ্ছিলাম কি ক্ষতি হতো পূরবীর—একটা কথা বললে! পূরবী কোনোদিনই তো এমন আড়ষ্ট সংস্কারগ্রস্ত ছিল না। কিন্তু একটি মেয়ে, কুমারী অবস্থায় যার সঙ্গে আমি কোনোদিন একটা কথাও বলিনি নতুন বিবাহিতা হিসবে তাকে যেদিন দেখলাম, সেদিন আমি এক মুখ হেসে তাকিয়ে রইলাম তার দিকে, বললাম, আরে, বাঃ কবে হলো? মেয়েটি উত্তর না দিয়ে লাজুকভাবে হাসলো।

মেয়েটির সঙ্গে আমার কোনোদিন আলাপই হয়নি, আমি তার নামও জানি না। মেয়েটিও আমার নাম জানে না। দীর্ঘ তিন বছর মৌলালির মোড়ে একটা অফিসে আমি চাকরী করতাম – প্রতিদিন ঠিক দশটা বেজে দশে বাসে উঠতাম শ্যামবাজার থেকে। রামমোহন লাইব্রেরির সামনে থেকে মেয়েটি। প্রত্যেকদিন ওকে দেখেছি, প্রত্যেকদিন রামমোহন লাইব্রেরির স্টপ এলে আমি মেয়েটির জন্য উঁকি মেরে দেখতাম। একটু কালো, ছিপছিপে চেহারা লাবণ্যমাখা মুখে মেয়েটিকে প্রত্যেকদিন দেখা এমন অভ্যেস হয়ে গিয়েছিল যে, এক আধদিন ওকে না দেখলে চিন্তিত হয়ে পড়তাম। মেয়েটিও দেখতো নিশ্চয়ই আমাকে—আমি দরজার

সামনে ঝুলন্ত অবস্থা থেকে নেমে দাঁড়িয়ে মেয়েটির জন্য জায়গা করে দিতাম। এক একদিন কণ্ডাকটরকে চেঁচিয়ে বলেছি, রোককে, রোককে, জেনানা হ্যায়! যেন আমারই কোনো আত্মীয়া। কিন্তু কোনোদিন একটাও কথা হয়নি।

আজ মেয়েটিকে নতুন সিঁদুরপরা ও নতুন বেনারসী-পরা চেহারায় সিনেমা হলের সামনে দেখে আচমকা আমার মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল, আরে! বাঃ! কবে হলো? মেয়েটি লাজুকভাবে মুখ নিচু করলো—তারপর আবার মুখ তুলে বললো, গত মাসের সাত তারিখে। মেয়েটি আবার হাসলো, আমিও হাসলাম। জীবনে আর আমাদের কোনো কথা হবে না—শুধু এক ঝলক অনাবিল খুশীর বিনিময় হয়ে গেল।

তেরো

বললুম, তোমার কপালের টিপটা ব্যাঁকা।

মেয়েটি বললো, যাঃ, মোটেই না।

বলার সময় মেয়েটি হাসেনি। বরং যখন 'যাঃ' বললো, সেটা শোনালো ছোট্ট ধমকের মতো। আমি তখনও খরচোখে ওর ভ্রূসন্ধিতে তাকিয়ে আছি, সম্মোহনকারীর ভঙ্গিতে। চোখ না সরিয়েই মৃদুস্বরে টেনে টেনে ঘরের অন্যান্য লোকেরা যাতে ঠিক শুনতে না পায় এমনভাবে বললুম, আমি এ পর্যন্ত যত সুন্দরী মেয়ে দেখেছি, সকলেরই কপালের টিপ ব্যাঁকা হয়। কখনোই ঠিক মাঝখানে বসে না।

মেয়েটি মুখ নিচু করলো। আমার এই স্তুতি একটু অপ্রত্যক্ষ বলে মুখ নিচু করতেই হয় এ সময়ে। কোনো উত্তর দেওয়া যায় না। আমি তখনও দ্বিধায় দুলছি। আর একটু কি বলবো? ঠিক আমার

যা মনের কথা? কিন্তু বলার বিপদও আছে—এক এক সময় প্রতিফল এত খারাপ হয়! তবু আমিও মুখ নিচু করে বললুম, কেন ঠিক হয় না জানো? কেন? এবার মেয়েটি স্পষ্টই হাসলো। উত্তর শোনার প্রতীক্ষায় যে-রকম হাসতে হয়।

বললুম, কারণ, সুন্দরী মেয়েরা যখন আয়নার সামনে টিপ পরতে যায়, তখন তারা নিজের মুখ সবচেয়ে নিবিড়ভাবে দেখে। স্নো-পাউডার মাখা কিংবা চুল আঁচড়ানোর সময় আয়নায় দাঁড়ানোর সঙ্গে এর তুলনাই হয় না। অন্য সব সময়ই তারা আলগাভাবে দেখে, কিংবা দেখে সারা শরীর—অথবা ব্লাউজের হাতাটা কুঁচকে গেছে কিনা. কানের পাশে পাউডারের দাগ—এই সব। কিন্তু শুধু মুখখানা—সম্পূর্ণ মুখও নয়, দুই চোখ, নাকের সামান্য অংশ, ঈশ্বরের কবিতার খাতার মতো নির্মল কপাল (এইটা বলার সময় আমি টুক করে একটু হেসে নিলুম) —মুখের যেটুকু সবচেয়ে সুন্দর অংশ, মেয়েরা সেটা দেখতে পায়। দেখে অবাক হয়ে যায়, হাত কেঁপে যায়, ঠিক জায়গায় টিপ বসে না। পৃথিবীর কোনো সুন্দরী মেয়ের এ পর্যন্ত বসেনি, আমি জানি। টিপ পরতে গিয়ে প্রত্যেক মেয়েই একবার করে নার্সিসাস হয়ে যায়। অবশ্য খুব গভীর দুঃখ পেলেও শুনেছি কোনো কোনো মেয়ে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে এরকম নিবিড়ভাবে নিজেকে দেখে। কিন্তু তাদের কথা আমি ঠিক জানি না।

এবার মেয়েটি কাচের গ্লাস ভাঙার মতন বেশ জোরে হেসে উঠলো। বললো, ইস্, বাকি সব সুন্দরীদের কথাই কেন জেনে বসে আছেন। খুব চালিয়াতি, না?

আমিও বেশ জোরে হাসলুম। আমার বিপদ কেটে গেল। মনের ভেতরটা খুব পরিষ্কার এবং ভালো লাগতে লাগলো।

না, এইভাবে কোনো গল্প শুরু করতে যাচ্ছি না। এ গল্পের এখানেই শেষ এবং কোনো ক্রমশ নেই। আমি আমার একটি ছোট্ট বিপদমুক্তির ইতিহাস জানালুম। আমার জীবনটাই বিপদে ভরা,

প্রত্যেক পায়ে পায়ে আমাকে বিপদের হাত থেকে সাবধান হয়ে চলতে হয়। তার মধ্যে একটা বিপদ, কোনো নারী বা বালিকার রূপের প্রশংসা করার পর তার মুখের কথা শুনে আমার কি অবস্থা হবে। আমি সব সময় ভয়ে ভয়ে থাকি। এ ভয় শারীরিক নয়। মেয়েটি আমাকে চপেটাঘাত করবে, না তার ব্যায়ামবীর দাদা এসে আমার হাত মুচড়ে দেবে, বা তার স্বামী বা হবুস্বামী এসে আমার সামনে রাগে নাকঝাড়ার আওয়াজ করবে, এরকম কোনো আশঙ্কার কারণ আমার নেই! আমার স্তুতি নির্লোভ আমার আশঙ্কা মেয়েটির উত্তর যদি আমার মনঃপুত না হয়। আসলে রূপের চেয়েও রূপসীর মুখের ভাষারই বোধহয় আমি বেশী ভক্ত। যাকে আগে সুন্দর মনে হয়েছিল, অনেক সময় তার মুখের উত্তর শুনে আমার তাকে কুৎসিত মনে হয়েছে।

অথচ, রূপ দেখলে প্রশংসা বা স্তুতি না করেও পারি না। প্রশংসার ভাষা এমন কিছু কঠিন নয়—আমি যদিও একটু কাঁচা—তবে অনেকেই খুব সুন্দর সুরুচিসম্মতভাবে প্রশংসা করতে জানে। কিন্তু সবচেয়ে শক্ত প্রশংসার উত্তরে কি বলা হবে—সেই ভাষা। প্রশংসার উত্তরে চুপ করে থাকা উচিত নয়, সেটা দৃষ্টিকটু, তাহলে মনে হবে, অহংকার কথাটা গ্রাহ্যই করা হয় না। আবার প্রশংসায় বিগলিত হয়ে পান্তুয়া-মুখে-পোরা গলায় উত্তর শুনলেও গা জ্বলে যায়

আমি প্রায়ই ভাবি, কোনো নবীন লেখককে যখন কোনো প্রবীণ লেখক প্রশংসা করে, তখন নবীনটি কি করবে? চুপ করে বসেও থাকতে পারে না, হেঁ-হেঁ ধরনের হাসতেও পারে না—তা হলে সেই সময়টি নিশ্চয়ই তার খুবই অস্বস্তি বা সংকটের সময়! অবশ্য, আমার এ ভাবনা নেই—কাজ তো খই ভাজার মতন, কারণ এরকম সৌভাগ্য আমার এ পর্যন্ত হয়নি,অদূর-ভবিষ্যতে এমন সম্ভাবনাও নেই যে, আগে থেকে রিহার্সাল দিয়ে নেবো

তবে প্রশংসার সময় সবচেয়ে অরুচিকর জিনিষ, প্রশংসার উত্তরে

প্রতি-প্রশংসা। আমি যদি কারুকে বলি আপনার অমুক ব্যাপারটা খুব সুন্দর তার উত্তরে যদি শুনি, আপনারাও তো অমুকটা আ-হাহা—তাহলেই আমার গা রি-রি করে। নেমতন্ন-বাড়িতে কোনো একটা রান্নার প্রশংসা করলেই তার পাতায় সেই পদ আরও খানিকটা এনে ঢেলে দেওয়া হয়—এই নিয়মটি যেমন কুৎসিত। একমাত্র মেয়েরাই, অধিকাংশ মেয়েরাই ন্যায্যভাবে প্রশংসা গ্রহণ করতে জানে। কারণ, মেয়েদের ক্ষেত্রে ঐ প্রতি-প্রশংসা করার ব্যাপার নেই। একটি পুরুষ যদি একটি নারীর রূপের প্রশংসা করে উন্মুক্ত গলায় তার উত্তরে কোনো নারীই পুরুষের রূপের প্রশংসা করবে না। কারণ মেয়েরা জানে রূপের প্রশংসা তাদের সব সময়ই প্রাপ্য, তাদের দাবি—কিন্তু প্রশংসা পাবার জন্য কোনো পুরুষকে অনেক যোগ্যতা অর্জন করতে হয়। তা ছাড়া মেয়েদের প্রশংসা হয় নিন্দাচ্ছলে—অর্থাৎ ব্যাজস্তুতি। অন্নপূর্ণা যেমন তাঁর স্বামী সম্পর্কে বলেছিলেন, কোনো গুণ নাই তার কপালে আগুন! এখনও সব মেয়েরাই এ রকম ভাষা ব্যবহার করে। কোনো মেয়ে যদি কোনো ছেলের মুখের দিকে তাকিয়ে বলে দাঁড়ি না কামানোই বুঝি স্টাইল হয়েছে আজকাল? কি বিশ্রী খোঁচা খোঁচা দাড়ি—ঠিক কয়েদীর মতো চেহারা হয়েছে।—তাহলেই বুঝতে হবে মেয়েটি আসলে ছেলেটির মুখের প্রশংসা করছে। ব্যাজস্তুতি ছেলেরা সহ্য করেও বোঝে, মেয়েরা সহ্যই করতে পারে না। আবার সোজাসুজি স্তুতিতে ছেলেরা একেবারে হতভম্ব হয়ে যায়, নাক-চোখ পর্যন্ত গোল হয়ে সারা মুখ গোল হয়ে যায়, কোনো কথাই বলতে পারে না। কিন্তু মেয়েরা গ্রহণ করতে পারে, রূপের প্রশংসা শুনে মেয়েরা আরও রূপসী হয়ে ওঠে সেই মুহূর্তে।

মনে করা যাক্, একটি সাহেবী কায়দার নেমন্তন্ন বাড়িতে এক মহিলার সঙ্গে আমার দেখা হল। তিনি একটি কোঁকড়ানো ফুলকাটা জামা পরেছেন। মহিলার কপালের দু'পাশে চূর্ণ চুল জংলী ফুলের মতো স্তবক বেঁধে আছে। ঘুরতে ঘুরতে তাঁর সামনে এসে আমি

দাঁড়ালুম হয়তো। আমি অনেক কথা বলতে পারতুম, কেমন আছেন, অমুকের সঙ্গে কি দেখা হয়, অমুক ফিল্ম দেখেছেন কি না, অমুক লেখকের লেখা—ইত্যাদি অনেক বাজে কথা! কিন্তু যে কথাটা আমার প্রথমেই মনে এলো, এক মিনিট দ্বিধা করে আমি সেই কথাই বললাম, আপনার জামার সঙ্গে আপনার সুন্দর চুল—অথবা আপনার সুন্দর চুলের সঙ্গে আপনার জামা—চমৎকার মানিয়েছে। মনে হচ্ছে, ভিড়ের মধ্যেও আপনি আলাদা। মহিলা মুখ টিপে হেসে বললেন, আপনাকে কি আমি ধন্যবাদ দেবো?

আমি আঁতকে উঠলুম। মেয়েদের মুখ থেকে ধন্যবাদ শুনলে আমার মনে হয়, কেউ যেন আমার শরীরে গরম লোহার শিক্‌ ঢুকিয়ে দিচ্ছে। আর এই সাহেবী কায়দার নেমন্তন্নে ধন্যবাদের তো ছড়াছড়ি।

মহিলা বললেন, এসব জায়গায় ধন্যবাদ দেওয়াই রেওয়াজ। কিন্তু আপনাকে আমি ধন্যবাদ জানাবো না।

এই বলে তিনি মুখের চাপা হাসিটুকুই রেখে দিলেন কিছুক্ষণ। আমার বিপদ কেটে গেল।

আমার নিতান্ত ভাগ্যদোষে এবং ঘটনাপরম্পরায় প্রায়ই কিছু কিছু সাহেব-মেমের সঙ্গে আমার দেখা হয়ে যায়। সাহেব-মেমদের সঙ্গে কথাবার্তায় কমা ফুলস্টপের মতো প্রায়ই 'ধন্যবাদ' বসিয়ে যেতে হয়, আমি সব সময় সজাগ থাকি। কিন্তু পারতপক্ষে আমি মেমসাহেবদের এড়িয়ে যাই, কথাবার্তা বিশেষ বলি না। যদি বা কখনো পাকে-চক্রে কথা বলতেই হয়, কিছুতেই কোনো মেমের রূপের প্রশংসা করি না কখনো। কারণ জানি রূপের প্রশংসা শুনলে কোনো মেমের মুখে লজ্জার আভা আসবে না, অর্ধস্ফুট হাসি দেখা দেবে না মুখের একটি রেখাও না কাঁপিয়ে তিনি বলবেন, ধন্যবাদ ধন্যবাদ। তারপরই আবার অন্য কথা। আমার কাছে এ জিনিস ভয়ংকর। সুতরাং মেমসাহেবদের রূপের প্রশংসা আমার মুখ দিয়ে বেরয় না। আর সত্যিকারের রূপসী মেমসাহেবদের মধ্যে ক'জন

আছে কে জানে—আমার তো একটিও চোখে পড়েনি। এ কথাটাও আমি সুযোগ পেলেই কোনো বাঙালী মেয়েকে জানিয়ে দিই!

চৌদ্দ

রামায়নের রাবণ সীতাহরণের চেয়েও বড় অন্যায় কাজ করেছিলেন একটি। তখনকার ক্ষত্রিয়-ধর্ম অনুযায়ী রূপসী নারীহরণ হয়তো খুব অস্বাভাবিক ব্যাপার ছিল না। তা ছাড়া, সীতা হরণের প্রধান সার্থকতা, ঐ ঘটনাটি না ঘটলে রামায়ণ এরকম একটি মহৎ কাব্য হয়ে উঠতে পারতো না। কিন্তু রাবণ সন্ন্যাসীর ছদ্মবেশে সীতাকে হরণ করতে গিয়েছিলেন কেন? সব ছদ্মবেশই যখন তিনি ধরতে পারতেন—তখন রামের ছদ্মবেশে গণ্ডি পার হলেই পারতেন!

রাবণ সন্ন্যাসীর ছদ্মবেশ ধরার পর থেকেই মানুষ আর কোনো সন্ন্যাসীকে ঠিক বিশ্বাস করে না! সব সন্ন্যাসীকেই প্রথমে ভণ্ড সন্ন্যাসী বলে ভাবে।

সাধুসন্ন্যাসীদের সম্পর্কে আমার একটু দুর্বলতা আছে। আমার একেবারেই ধর্ম-বিশ্বাস নেই, নাস্তিকস্য নাস্তিক যাকে বলে, কিন্তু সন্ন্যাসীর জীবন আমাকে আকৃষ্ট করে। কোথাও শিকড় গাড়ে নি, কোনো আসক্তি নেই, সব কিছু ছেড়ে এই বিশাল বিশ্বে একা হয়ে গেছে এই সব মানুষ। গেরুয়া রংটার মধ্যেও খানিকটা ঔদাসীন্যের ছোঁয়া আছে। অবশ্য চেলাচামুণ্ডা বা ভক্তদের মাঝখানে বসে থাকেন যে-সব সাধু তাঁদের সম্পর্কে আমি উৎসাহহীন। কিংবা কলকাতায় যে-সব বিখ্যাত সাধু বা মোহন্ত মাঝে মাঝে এসে ওঠেন – আর তাঁর বাড়ির সামনে বড় লোক ভক্তদের গাড়ির লাইন লেগে যায়—তাঁদের সম্পর্কেও আমার মনোভাব ব্যক্ত না করাই শ্রেয়। আমার ভালো লাগে একা একা ভ্রাম্যমাণ সন্ন্যাসীদের—একটু ঈর্ষাও

হয়, মনের কোনো একটা ইচ্ছে উঁকি মারে—আমিও ওদের মতন বেরিয়ে পড়ি।

জানি, খুনী কিংবা চোর-ডাকাতরাও সন্ন্যাসীর ছদ্মবেশে ঘোরে। কিংবা অনেক সাধুই আসলে গেরুয়া পরা ভিখারী। অর্থাৎ সেই রাবণের ছদ্মবেশ। তবু প্রথম দেখলেই কোনো সাধুকে আমার ভণ্ড হিসেবে ভাবতে ইচ্ছে করে না, প্রথমে আমি তাদের বিশ্বাস করতেই চাই।

ট্রেনের থার্ড ক্লাস কামরায় একদল ছেলে একজন সাধুকে ক্ষেপাচ্ছিল। এই সাধুটির বয়েস বেশী নয়, তিরিশের কাছাকছি, খুবই রূপবান। সত্যিকারের গৌরবর্ণ যাকে বলে, টিকোলো নাক—তবে দাড়ি ও জটার বহর আছে। হঠাৎ দেখলে মনে হতে পারে, কোনো সিনেমার নায়ক বোধ হয় শুটিং-এর জন্য সাধু সেজেছে। তা অবশ্য নয়, আশেপাশে কোনো ক্যামেরা নেই—তা ছাড়া সন্ন্যাসীর মুখে যে নির্মল ঔদাসীন্য কোনো সিনেমার নায়কের পক্ষে তা আনা খুব শক্ত। সাধুটি কোন্ জাত তা বোঝা যায় না। তবে বাঙালী নয়, বেশ দুর্বোধ্য হিন্দীতে কথা বলছিল। ওকে আমার খাঁটি সন্ন্যাসীই মনে হচ্ছিল।

একটি ছেলে তাকে বললো, ইস্, গা দিয়ে গাঁজার বিটকেল গন্ধ বেরুচ্ছে! এই যে সাধু বাবা; একটু সরে বসো না!

সাধু ছেলেটির কথা শুনতে পেল না। স্থির দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে রইলো।

—কি বাবা, ভস্ম করে দেবে নাকি!

—ওসব এঁটেলু এখানে ছাড়ো! সাধু হয়েছো, হেঁটে যেতে পারো না?

—গাঁজা ফাঁজা থাকে তো বার করো!

—দাড়িটা আসল তো?

—টেনে ছ্যাখ না!

সন্ন্যাসীটিকে নিয়ে একটা তাণ্ডব শুরু হয়ে গেল। কেউ তার চুল দাড়ি টেনে দেখতে লাগলো, কেউ তার ঝোলা হাতড়াতে লাগলো, কেউ তাকে ঠেলে সিট থেকে মাটিতে বসাতে চায়। সাধুটি শান্ত ধরনের রেগে উঠছে না. দুর্বোধ্য হিন্দীতে কি যেন বলছে আর মাঝে মাঝে হাত জোড় করছে। আমার কষ্ট হচ্ছিল ওর জন্য। তবে, রেলের কামরায় আট-দশটি ছেলে মিলে আজকাল যদি কিছু কাণ্ড শুরু করে, তার তো কোনো প্রতিবাদ করা হয় না।

তবু আমি মৃদু গলায় বলুলম আহা থাক্ না বেচারী চুপচাপ বসে আছে—

একজন ছেলে বললো, ডব্লউটি'তে যাচ্ছে, তা আবার সীটে বসা কেন ?

আর একজন বললো, আপনি চুপ মেরে থাকুন ! আপনার সঙ্গে কোনো কথা বলেছি ?

আমাকে চুপ করেই যেতে হলো। আমি দৃঢ় নিশ্চিত যে, ঐ আট দশটি ছেলের মধ্যে অন্তত চার পাঁচজন নিজেরা টিকিট কাটেনি। তবে, আজকাল নিজেরা একটা অন্যায় করেও অন্যদের সে সম্পর্কে অভিযোগ জানানো যায়। মনে মনে বললাম সাধুবাবা, কি আর করা যাবে, সব রাবণের দোষ !

ঐ ছেলেগুলোও নিশ্চয়ই আসলে খারাপ নয়। কলেজ থেকে ফেরার পথে একটু আমোদ করছে। আমোদটা যে মাত্রা ছাড়িয়ে যাচ্ছে সেটুকু খেয়াল নেই। ঐ ছেলেগুলোর প্রত্যেকের সঙ্গে যদি আলাদাভাবে দেখা করা যায়, নিশ্চয়ই দেখবো ভদ্র, বুদ্ধিমান ছেলে। আমারই মতন মধ্যবিত্ত ঘরের ছেলে তো, আমার চেয়ে আর আলাদা কি হবে ? একা একা এরা প্রত্যেকেই সহজ সাধারণ কিন্তু একটা দঙ্গল হলেই মাত্রা ছাড়িয়ে যায় তখন একজন আর একজনকে টেক্কা দিয়ে খারাপ হতে চায়। খারাপ হওয়াই আজকালকার ফ্যাশান, নইলে বন্ধুদের কাছে মান থাকে না।

কোথায় কোন পাড়ায় কবে দুটো পাজী ছেলে চাঁদা দিতে রাজী

হয়নি বলে এক ভদ্রলোককে ছুরি মেরেছিল, তারপর থেকে চাঁদা আদায়কারী ছেলেদের সম্পর্কেই মানুষের একটা বিশ্রী ধারণা হয়ে গেছে। ঐ ছেলে দুটিও আসলে ছদ্মবেশী রাবণ। নইলে, পাড়ায় সবাই মিলে চাঁদা দিলে পূজো হবে, সবাই মিলে আনন্দ করবে—এইটাই তো স্বাভাবিক। বহুকাল ধরে এ-রকম চলছে, লোকে তো কখনো আপত্তি করেনি। তবে কারুর বেশী চাঁদা দেবার অসুবিধে থাকলে কিংবা না দিতে চাইলে মারধোর করার নিয়ম ছিল না। প্রথম যে ছেলে দুটো মারলো, তারা আবহাওয়া বদলে দিল। ঐ ছেলে দুটো আসলে গুণ্ডা ছিনতাইবাজ, ওরা চাঁদা আদায়কারীর ছদ্মবেশ ধরলো কেন? সরাসরি ছুরি দেখিয়ে কেড়ে নিলেই পারতো! রাবণের মতন আর একটা অন্যায় করলো বলে ওরা সমস্ত চাঁদা আদায়কারীদের ওপর কলঙ্ক দিয়ে গেল। এখন কেউ চাঁদা চাইতে এলেই লোকে সন্দেহ করে, দিতে চায় না। আর ওরাও দেখেছে, জোর করা কিংবা ভয় দেখানোই সহজ পথ—ফলে সম্পর্কটা এত বিশ্রী হয়ে গেল।

সেজমাসী হন্তদন্ত হয়ে এসে চোখ গোলগোল করে বললেন, জানিস, সেই মেয়েটাকে আজ আবার দেখলাম ল্যানস্‌ডাউন রোডের মোড়ে—

জিজ্ঞেস করলাম, কোন্ মেয়েটা?

সেই যে সেদিন এসে কাঁদছিল! কি পাজী! কি পাজী! আজও ঠিক সেই একরকম—

মাস দু' এক আগে মেয়েটি আমাদের বাড়ির দরজার কাছে বসে কাঁদছিল। বছর পঁচিশেক বয়েস চেহারা, দেখলে মোটামুটি ভদ্র পরিবারেরই মনে হয়। শুধু কেঁদেই চলেছে, জিজ্ঞেস করলে কিছুই বলতে চায় না। আমার সেজমাসী যেমন রাগী তেমনি দয়ালু। কথায় কথায় লোকের ওপর রেগে ওঠেন—আমার ওপর তো অনবরতই রেগে আছেন। আবার লোকের দুঃখ কষ্ট শুনলে ঝরঝর

করে কেঁদে ফেলেন—মনটা এত নরম। মেজমাসী প্রথমে রাগ করে বলছিলেন, এই, তুমি এখানে বসে কাঁদছো কেন? কাঁদবার আর জায়গা পাওনি?

মেয়েটি আস্তে আস্তে তার দুঃখের কথা বললো। কাল রাত্তিরে তার বাবা মারা গেছেন। মায়ের খুব অসুখ। তিনটে ছোট ছোট ভাইবোন! পাড়ার ছেলেরা তার বাবার মৃতদেহ দাহ করার জন্য উদ্যোগ করছে, কিন্তু ওদের বাড়িতে একটাও টাকা নেই। পাটনায় কাকা থাকেন, তাঁকে টেলিগ্রাম করা হয়েছে, তিনি যদি টাকা পাঠান কিংবা আসেন···ভদ্র পরিবারের মেয়ে। কারুর কাছে টাকা চাইতেও পারছে না। তার কানের দুল দুটো বাঁধা রেখে যদি গোটা পঞ্চাশেক টাকা দিই!

মেয়েটিকে দেখে সন্দেহ করার কোনো উপায় নেই। তাছাড়া আমাদেরও তো মাসের শেষে প্রায়ই কোনো টাকা থাকে না, এক টাকা দু'টাকা দিয়ে কাজ চালাতে হয়। তখন যদি কোনো দুর্ঘটনা ঘটে? ধরা যাক্, মাসের শেষ রবিবারের সকালে? তা হলে তো আমাদেরও টাকার জন্য—

টাকার জন্য দুল বাঁধা নেবার কোনো প্রশ্নই ওঠে না, সেজোমাসীরই তখুনি চোখ ছলছল করতে শুরু করেছে। ঝড়াক করে দিয়ে দিলেন পঞ্চাশ টাকা। বললেন, আরও যদি কিছু দরকার হয়, কাল এসো—

কাল আর আসেনি, কোনোদিন আসেনি। দু' মাস বাদে মেয়েটিকে সেই একই গল্প বলতে শুনেছেন আর একটা বাড়িতে—সেই কাল বাবা মারা গেছে, পাটনায় কাকাকে টেলিগ্রাম, কানের দুল বাঁধা দেওয়া। সেজোমাসী রেগে আগুন। ব্লাডপ্রেসার বেড়ে গিয়ে সেজোমাসী না অজ্ঞান হয়ে যান!

মেয়েটি রাবণের মতন ওরকম ভুল করলো কেন? এরপর সত্যিই যদি আর কারুর বাবা মারা যাবার পর হঠাৎ বিপদে পড়ে

সাহায্য চায়···তখন তার সত্যিকারের দুঃখের মুহূর্তেও তো লোকে তাকে রেগে তাড়া করে যাবে। কেউ বিশ্বাস করবে না। ঐ মেয়েটির বাবা দু' মাস ধরে প্রত্যেকদিন মারা যেতে পারে না, টেলিগ্রাম পৌঁছুতে যতই দেরী হোক, দু' মাস লাগে না—তবুও মেয়েটির সত্যি সত্যি সংসারে অভাব আছে নিশ্চয়ই! কিন্তু ভিক্ষে করার তো অনেক পথ আছে। ঐরকম মিথ্যে গল্প বলায় ফল হলো এই, সত্যিই যে ভিক্ষুক নয়, অথচ হঠাৎ বিপদে পড়েছে—সেও আর সাহায্য পাবে না।

ছদ্মবেশ ধরার আগে এগুলো ভেবে দেখা নিশ্চয়ই উচিত। রাবণেরও উচিত ছিল।

পনেরো

এলা নাম্নী কোনো মেয়েকে আমি চিনি না। কখনো এই নামের কোনো জীবিত মেয়ের কথাও শুনিনি। কিন্তু প্রত্যেকটা নামের সঙ্গেই কল্পনার একটি মুখ থাকে। সুতরাং এলা যদি কোনো মেয়ের নাম হয়, তবে তার মুখখানি কেমন দেখতে হবে—সে সম্পর্কে আমার কল্পনায় একটি স্পষ্ট ছবি ছিল।

শ্যামলী নামের যত মেয়ের সঙ্গেই আমার দেখা হোক—ঐ নাম শুনলেই আমার ছোট পিসীমার কথা মনে পড়ে। সাধারণত একটু কালো মেয়েদেরই নাম রাখা হয় শ্যামলী—কিন্তু আমার শ্যামলী পিসীমা ছিলেন ধপ্‌ধপে ফর্সা। বড় বেশী ফর্সা। একটু লম্বাটে, ডিম ছাঁদের মুখ, নাকে একটা মুক্তোর নাকছবি—কথায় কথায় লুটোপুটি হতেন। শ্যামলী পিসীমা মারা গেছেন অনেকদিন আগে, কিন্তু এখনও কোনো সপ্রতিভ, আধুনিকা মেয়ের সঙ্গে আলাপ হলে যদি শুনি তার নাম শ্যামলী, তবুও আমার সেই হাস্যমুখী ফর্সা

পিসীমার মুখখানাই প্রথমে মনে পড়ে। অল্পক্ষণের জন্যই যদিও পরক্ষণে সেই মুখ ভুলে সম্মুখবর্তিনীর প্রতি মনোযোগী হয়ে পড়ি। মৃতদের বেশী মনে রাখতে নেই।

এমনকি ইন্দিরা নামটি শুনলেও আমার ইন্দিরা গান্ধীর মুখ মনে পড়ে না। ভবানীপুরে থাকার সময় আমাদের পাশের বাড়িতে একটি ইন্দিরা নামের মেয়ে থাকতো—তেরো-চোদ্দ বছর বয়েস, খানিকটা কালোর দিকে—বৃষ্টিভেজা মাটির মতন গায়ের রং ঢলঢলে চোখ দুটি—একটু বোকা বোকা—কিন্তু গলার আওয়াজটা ছিল শুভলক্ষ্মীর চেয়েও সুরেলা। ইন্দিরাও বেঁচে নেই, টাইফয়েডে হঠাৎ মারা গিয়েছিল। এখনকার মেয়েদের মধ্যে ইন্দিরা নামটা শোনা যায় না তেমন, তবু, কোথাও টাইফয়েড অসুখটার কথা শুনলেই ইন্দিরার মুখটা মনে পড়ে এক পলক। মৃতদের মুখচ্ছবি স্মৃতিতে সহজে মরে না।

একটা পার্টিতে একটি মেয়ের অপূর্ব নাম শুনেছিলাম। খুব কায়দার পার্টি, বিলিতি বাজনার সঙ্গে নাচেরও ব্যবস্থা ছিল, ছিল চার প্রকার পশুপাখির মাংস, ছিল তিন প্রকার লঘু ও কড়া মদ। আমার যে-কোনো আনন্দ উৎসবই ভাল লাগে, দিশি-বিলিতি যে-কোনো সঙ্গীত-নৃত্যই ভালো লাগে, মদ-মাংস সম্পর্কে তো কথাই নেই। শুধু ভালো লাগছিল না, উপস্থিত কিছু ছেলেমেয়েদের। আজকাল একদল বোকা ছেলেমেয়ে তৈরী হয়েছে, বাঙালী হয়েও যারা নিজেদের মধ্যে পিজিন ইংরেজিতে কথা বলতে ভালবাসে—পার্টিতে সেই রকম বোকা ছেলেমেয়ের দলই ছিল বেশী। তাদেরই মধ্যে একটি মেয়ে, শাড়ি পরেছে স্কার্টের ধরনের আঁট ভাবে পেঁচিয়ে, শিঙ্গল করা চুল, মুখখানা ঝকঝকে ভাবে মাজা, নিশ্চিত লরেটো হাউস বা কোনো মিশনারি কলেজে পড়া মেয়ে, মুখ দিয়ে ধাতব ইংরেজির খই ফুটছে। মেয়েটিকে দেখতে ভালো, অর্থাৎ তার শরীরখানি সমানুপাতিক—সুতরাং তার সাজসজ্জা যাই হোক—তাতে কিছু যায় আসে না—আমি

মেয়েটির দিকে তাকিয়েছিলাম একদৃষ্টে। মিশনারি স্কুল-কলেজে পড়া ছেলেমেয়েদের সম্পর্কে একটা উদ্ভট ব্যাপার আমার মনে পড়ছিল। সর্বত্যাগী সন্ন্যাসী সন্ন্যাসিনীরা—যে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান চালায়—যারা নিজের দেশ-সংসার-প্রতিষ্ঠা ছেড়ে এসে এদেশের ছেলেমেয়েদের লেখা পড়া শেখানোর কাজে আত্মনিয়োগ করেছে—তাদের কাছ থেকে শিক্ষা পেয়েও এই সব ছেলেমেয়েরা বেশির ভাগই এমন উৎকট রকমের বোকা আর চালিয়াৎ হয় কি করে? কি এর সামাজিক ব্যাখ্যা? হঠাৎ আমার ইচ্ছে হলো ও মেয়েটির নাম জানতে হবে। নাম না জানলে কোনো মেয়ের ছবি সম্পূর্ণ হয় না। ভিড় ঠেলে আমি আস্তে আস্তে মেয়েটির দিকে এগিয়ে যেতে লাগলাম। কাছাকাছি গিয়ে দাঁড়ালে আলাপ হবেই। হলোও তাই, আর একটি ছেলে আমার সঙ্গে মেয়েটির আলাপ করিয়ে দিল। মেয়েটির নাম শুনে আমি চমকে উঠলুম। কিছুই বুঝতে পারলুম না। মেয়েটির নাম জাটাবেডা। জাটাবেডা বটআচারিয়া।

এ আবার কি অদ্ভুত নাম? মেয়েটি স্পষ্টতই বাঙালী, ঠোঁটের ভঙ্গি দেখলেই বাঙালী চেনা যায়—যতই ইংরেজি কায়দা দেখাক। একবার মনে হলো মেয়েটির মা বাঙালী, বাবা হয়তো অন্য দেশের অন্য জাতের লোক। কিন্তু কোন্ জাতের মেয়েদের এমন বিদঘুটে নাম হয়? আমার অস্বস্তি কাটলো না। এক ফাঁকে মেয়েটিকে একলা পেয়ে আমি ওর সামনে গিয়ে দাঁড়ালুম, মুখের ভাব বেশ কঠোর করে—আপনি টাপনি নয়, সরাসরি তুমি সম্বোধন করে জিজ্ঞেস করলুম, তোমার নামটা কি? ঠিক বুঝতে পারিনি তখন।

মেয়েটি চমকে আমার দিকে তাকালো, এক অনুপল আমার চোখে চোখ রাখলো, কি জানি ভয় পেলো কিনা—কিন্তু শরীরের সজাগ ভঙ্গি সাবলীল করে পরিষ্কার কৃষ্ণনগরের ভাষায় বললো, আমার নাম জাতবেদা ভট্টাচার্য। আমার দাদামশাই এই নাম রেখেছিলেন—

আমি জিজ্ঞেস করলুম, জাতবেদা মানে কি ?

মেয়েটি এবার রহস্যময়ীর মতন হেসে বললো, আপনি বলুন না ? আপনি জানেন না ? খুব আনয়ুজুয়াল নেম, তাই না ?

আমি ভুরু কুঁচকোলুম। সত্যিই জাতবেদা কথাটার মানে আমি জানি না, আগে কখনো শুনিনি। আন্দাজে মানে তৈরী করা যায়। সংস্কৃত শব্দ, মাঝখানে বা শেষে বোধহয় একটা বিসর্গ থাকার কথা। যে বেদ নিয়ে জন্মেছে ? জন্ম থেকেই যে জ্ঞানী ? এই রকমই কিছু একটা হবে।

জিজ্ঞেস করলুম, তোমার দাদামশাই এই নাম রেখেছিলেন ?

মেয়েটি আবার ইংরেজিতে ফিরে গেছে। বললো, ইয়েস· হ্যাটস হোয়াট মাই মাদার টোল্ড মী। আই হার্ডলি রিমেম্বার হিজ ফেস দো—

হঠাৎ আমার হাসি পেল। কি অদ্ভুত বৈপরীত্য ? ভট্টাচার্য ব্রাহ্মণ পরিবারের মেয়ে, ভট্টাচার্য যখন—পূজারী, পুরোহিতের বংশ হওয়াও বিচিত্র নয়, দাদামশাই ছিলেন সংস্কৃতজ্ঞ ও ঐতিহ্যবাদী। তারপর পৃথিবীতে কত ওলোট-পালোট হয়ে গেছে, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ কত সংসারের ভাগ্য বদলে দিয়েছে· পুরুত বংশের মেয়ে এখন প্রাণপণে মেম হবার চেষ্টা করছে—কিন্তু দায় হয়েছে দাদামশাইয়ের চাপিয়ে দেওয়া ঐ নামটা। এমনই নাম যে· সংক্ষেপে জাটা কিংবা বেডা করলেও শ্রুতিমধুর হয় না। আহা বেচারা ! এফিডেবিট করে নামটা বদলে নিতে পারে না ? এই তো কিছুদিন আগে রত্নাকর নামে এক ভদ্রলোক এফিডেবিট করে বাল্মীকি হয়ে গেলেন।

সেই থেকে কোনো অদ্ভুত উদ্ভট বিষম, উল্টোপাল্টা ব্যাপার দেখলেই আমার ঐ মেয়েটির কথা মনে পড়ে। বিহারের একটি গ্রাম্য রাস্তায় একটি গামছা-পরা লোকের হাতে হাত-ঘড়ি দেখেও আমার জাতবেদার কথা মনে পড়েছিল।

কিন্তু এলার কথা আলাদা। এলা নাম্নী কোনো মেয়েকে আমি

এ পর্যন্ত দেখিনি, তবু ঐ নামের মুখখানি আমার কল্পনায় স্পষ্ট আঁকা আছে। একদিন সেই মুখ আমি বাস্তবে দেখতে পেলাম। দেখে আকস্মিক খুশির ছোঁয়ায় অভিভূত হবার বদলে অকারণ ভয়ে আমার বুক দুরদুর করছিল।

অনেকদিন বাদে বন্ধু-বান্ধবদের সঙ্গে কলেজ ষ্ট্রীট কফিহাউসে দুপুরবেলা আড্ডা দিতে গিয়েছিলাম। এমন সময় পাশের টেবিলে এলো এসে বসলো। এলা তার সত্যিকারের নাম কিনা জানি না— কিন্তু অবিকল আমার কল্পনায় রাখা সেই মুখ। রবীন্দ্রনাথের 'চার অধ্যায়' এককালে আমার অত্যন্ত প্রিয় বই ছিল, সেই চার অধ্যায়ের নায়িকা এলা, সেই কোমল তেজস্বিনী প্রণয়িনী, অন্তু অর্থাৎ অতীন যাকে দেখে বলেছিল।

'প্রহর শেষের আলোয় রাঙা
সেদিন চৈত্র মাস
তোমার চোখে দেখেছিলেম
আমার সর্বনাশ।'

এই সেই এলা, আজ সশরীরে, দুপুরবেলা কফিহাউসে। চায়ের দোকানে এলার হঠাৎ চলে আসার বর্ণনা আছে চার অধ্যায় উপন্যাসে। কিন্তু এ যে বাস্তব কফিহাউস। একটা অজানা ভয়ে আমার বুক দুরদুর করতে লাগলো।

একটা টেবিলে একজন যুবক একা বসেছিল, আর দুটি মেয়ের সঙ্গে সেই এলা এসে বসলো সেই টেবিলে। আমার ঠিক সামনে। কল্পনায় যে-রকম ছিল, অবিকল সেই রূপ। অন্য মেয়েদের তুলনায় একটু বেশী লম্বা, রোগাও নয় স্থূলও নয়, ধপ্‌ধপে ফর্সা রং, শাদা রঙের শাড়ি, কোথাও প্রসাধনের কোনো চিহ্ন নেই—কিন্তু একটা চিক্কণ শ্রী ছড়িয়ে আছে সর্বাঙ্গে। ধারালো নাক, ধারালো চোখ – তবু মুখে কোনো কঠোরতা নেই। পাতলা ঠোঁট দুখানি, সুষ্ঠু চিবুক। টেবিলের ওপর হাত রেখে তার ওপর চিবুক, হাসিমুখে কথা বলবে। ঠিক তাই।

ভূত দেখলে যে-রকম ভয় করে, কল্পনার মূর্তিকে বাস্তবে দেখলে সেইরকম ভয় হয়। ভয়-ভয় চোখে মেয়েটির দিকে আমি চেয়ে রইলুম। দুরন্ত ইচ্ছে হলো, উঠে গিয়ে ঐ টেবিলে মেয়েটিকে জিজ্ঞেস করি, আপনার নাম কি এলা? যদি না-ও হয়, তবু আপনি এলা—আপনি আমাদের টেবিলে এসে একটু বসুন! কিন্তু পরক্ষণে মনে হলো, একথা বলার কি অধিকার আছে আমার! আমি তো অন্ত নই! আমি একটা এলেবেলে লোক। আমি আগে থেকেই ওর ঐ রূপ কল্পনা করে রেখেছিলুম, তাতে ওর কি যায় আসে! বিশ্বাসই বা করবে কেন?

বন্ধুদের সঙ্গে কথা আর জমছে না, অন্যমনস্কভাবে হুঁ-হাঁ করে আমি ঘনঘন চেয়ে দেখছি মেয়েটিকে। ক্রমশ আমার ভয় বেড়ে যাচ্ছে। ভয়ে প্রায় কাঁপছি তখন। আমি এত ভয় পাচ্ছি কেন? বার বার নিজেকে প্রশ্ন করে উত্তরটা খুঁজে পেলাম। যদি আমার কল্পনার ছবিটা হঠাৎ রূঢ়ভাবে ভেঙে যায়—সেই ভয়। যদি দেখি মেয়েটি গোপনে নাক খুঁটছে কিংবা ওর হাসির আওয়াজ বিশ্রী কিংবা ঐ ছেলেটির সঙ্গে ও কোনো বদ রসিকতা করে তাহলে আমি জীবনে চরম আঘাত পাবো! বেশিক্ষণ তাকিয়ে থাকলে যদি আমার চোখে পড়ে ওর ঘাড়ে ময়লা কিংবা কনুই-এর কাছে শুকনো চামড়া তাও আমি সহ্য করতে পারবো না। ঐটুকু ত্রুটিও আমার পক্ষে সহ্য করা সম্ভব নয়!

অকস্মাৎ আমি উঠে দাঁড়িয়ে বন্ধুদের বললুম, চলি রে! সঙ্গে সঙ্গেই—মেয়েটির দিকে আর একবারও না তাকিয়ে—কফি হাউস থেকে বেরিয়ে এলাম। আমার কল্পনায় এলা চির রূপসী থাক। তাকে আমি নষ্ট হতে দিতে পারি না!

ষোল

ছেলেবেলায় মা বলতেন, অচেনা জলে কখনও স্নান করিস্‌নি। জলের আবার চেনা অচেনা কি, সব জলই তো সমান। আসলে, মা হয়তো বলতেন, অচেনা পুকুরে। পুকুর বা পুষ্করিণী কথাটা কি যে-জায়গার মধ্যে জল থাকে সীমাবদ্ধ আয়তনের নাম না সেই জলটুকুরই নাম, আমি ঠিক জানি না। তবে কোনো অচেনা জায়গায় গিয়ে পুকুরে স্নান করতে, কোনো রোগের ভয়ে নয়, বা সাঁতার জ্ঞানের অভাবে নয়—আমি পূর্ববাংলার নদী-নালার দেশ থেকে প্রায় সাঁতারে এসেছি কলকাতা—সুতরাং ডুবে মরার ভয় নেই, কিন্তু তবু যে-কোনো অজানা পুকুরে স্নান করতে, বিশেষত যদি আকারে একটু বড় এবং জলের রং কালো হয়, আমার ভয় ভয় করে। মনে হয় পুকুরের ঠিক মাঝখানে কোনো অজ্ঞাত চরিত্রের অতিকায় প্রাণী লুকিয়ে আছে। সেই জন্তুর চেহারাটা কল্পনা করতে পারি না বলেই ভয়ে আরও গা ছম্‌ছম্‌ করে। জানা শত্রুর চেয়ে অজানা শত্রু হাজারগুণ বেশী ভয়াবহ।

কোনো মানুষকে একবার অপয়া বলে ঘোষণা করলে যেমন আর সে অপবাদ কখনো ঘোচে না, যে-কোনো অঘটনের জন্য কোনো-না-কোনো সূত্রে সেই লোকটি দায়ী হয়ে যায়, সেই রকম পুকুর সম্বন্ধেও একবার 'রাক্ষুসে' বা সর্বনেশে নাম রটে গেলে, সে কলঙ্ক আর মুছে ফেলার কোনো উপায় নেই। এমন কোনো দিঘি বা পুষ্করিণী নেই, যেখানে দু'একটা মানুষ বা বাচ্চা ডুবে মরেনি, মানুষ তো কত রকম-ভাবেই মরে, পুকুরে ডুবে মরার মধ্যে এমন আশ্চর্য কি আছে, তবু পাড়ার কোনো প্রাজ্ঞ পিসীমা যদি উচ্চারণ করে ফেলেন, 'ও পুকুরটা রাক্‌সে, প্রত্যেক বছর একটা করে মানুষ নেয়—' তা হলে তৎক্ষণাৎ সে কথা রটে যাবে এবং স্থান পেয়ে যাবে ইতিহাসে। উত্তর

কলকাতার দেশবন্ধু পার্কের পুকুর সম্পর্কে আমরা ছেলেবেলায় গুজব শুনেছি, ওর মধ্যে কি একটা অদ্ভুত প্রাণী আছে, যা প্রতিবছর দুটো করে বাচ্চা ছেলে খায়। একবার নাকি কুড়ি হাত লম্বা একটা বিকট জন্তু জল থেকে উঠে এসে লোকজনকে তাড়া করে আবার জলে নেমে যায়। অবশ্য, সে জন্তু আমরা দেখিনি, দেখেছে এমন লোকের সঙ্গেও দেখা হয়নি, কিন্তু প্রতিবছর এখনও দুটো করে ছেলে মরছে ঠিকই।

যাই হোক আমাদের আগের বাড়িতে একটা বেশ বড় পুকুর ছিল। অবশ্য পুকুরটা ঠিক বাড়িতে নয়, এবং বাড়িটাও আমাদের নয়। করপোরেশনের এলাকা একটু ছাড়িয়ে, কোনো ধনী জমিদারের একদা যে প্রমোদ-বাগানবাড়ি ছিল, এখন দৈন্যদশায় সেটাতে অনেকগুলি ফ্ল্যাট বানানো, তারই একটাতে আমরা ছিলাম। বাড়ির পাশে একটা শ্রীহীন বাগান, সেখানে দু' একটা দুর্লভ-জাতীয় ফুলগাছের সঙ্গে অজস্র আগাছার ঝোপ, তার ওপাশে পুকুর—একদা চারদিক পাঁচিল ঘেরা ছিল নিশ্চিত, এখন দূরের রাস্তার গাড়োয়ান গাড়ি থামিয়ে বলদ-জোড়াকে এ পুকুর থেকে জল খাইয়ে নিয়ে যায়।

সারা গ্রীষ্মকালটা ওখানে স্নান করতাম। জল বেশ হাল্কা ও ঠাণ্ডা, তা ছাড়া শ্যাওলা ছিল না, একবার সাঁতার কেটে এপার-ওপার হয়ে এলে শরীর ঝরঝরে হয়ে যেতো।

সেই পুকুরটা সম্পর্কে হঠাৎ একবার অপয়া বা সর্বনেশে বদনাম রটে গেল। একটা ১৪।১৫ বছরের ছেলে বন্ধুদের সঙ্গে বাজি ফেলে পুকুরের মাঝখান থেকে একডুবে মাটি তুলতে গিয়েছিল। যখন ভেসে উঠলো, হাতে মাটি নেই, কিন্তু কপাল ও নাক জুড়ে অনেকখানি কাটা, ছেলেটা কোনোমতে পাড়ে সাঁতরে এসে অতখানি রক্ত ক্ষরণের পর অবশ হয়ে পড়লো। নিশ্চয়ই কোনো ইটের টুকরো বা গজাল বা পাথরে লেগে—কিন্তু লোকে অন্যরকম সন্দেহ করলো। বিশেষত, ত্রিলোচনবাবু, যিনি প্রত্যেকদিন ঐ পুকুরের একগলা জলে দাঁড়িয়ে গঙ্গাস্নানের স্তব পড়তেন, ঈষৎ গম্ভীরভাবে বললেন, এ

পুকুরটার দোষ আছে হে। আমি অনেকদিন থেকেই লক্ষ্য করছি। কুমীর বা কচ্ছপ না—ওরা লুকোতে পারে না, জানান্ দেয়ই। ওসব আগেকার দিনের জমিদারদের ব্যাপার—কত লোককে মেরে হয়তো পুঁতে রেখেছিল এই পুকুরেই। নইলে, সেদিন একটা মরা শালিক ভাসছিল কেন? পুকুরে কেউ কখনও মরা পাখি দেখেছে এর আগে?

ত্রিলোচনবাবুর বলার ভঙ্গি এমন যে, শুনলেই বিশ্বাস করতে মন চায়। বিশেষত শেষের কথাটা। সত্যিই কয়েকদিন আগে পুকুরে একটা মরা শালিক ভাসছিল। কি রকম যেন শুকনো ধরনের মরা, শরীরে কোনো আঘাত নেই, অর্থাৎ কেউ উড়ন্ত পাখিটাকে মারেনি। তা হলে কি আপনিই মরে পড়েছিল? আজ পর্যন্ত, কোনো স্বাভাবিকভাবে মৃত পাখি আমি দেখিনি। প্রেমেন্দ্র মিত্রের সেই গল্প 'চড়ুই পাখিরা কোথায় যায়?' বহুবার ভেবেছি। বাড়িতে কত চড়ুই পাখি, ঘুলঘুলিতে বাসা বাঁধে অথচ একটা মরা চড়ুই, স্বাভাবিকভাবে হার্ট ফেল করে বার্ধক্যে মরা, কোনোদিন বাড়িতে দেখিনি। মরার আগে সব পাখিরাই কোন এক অনির্দিষ্ট দেশে চলে যায় মরতে।

এরপর ঐ পুকুরে স্নানার্থীদের সংখ্যা যত কমতে লাগলো, তত বাড়তে লাগল গুজব। কে নাকি, দুপুরে একলা ঘাটে গিয়ে দেখেছে জলের মাঝখান থেকে অসংখ্য বুড়বুড়ি উঠছে। আরেকজন সত্যিই দেখেছে একটা কোন বিশাল প্রাণী জলের মধ্যে থেকে দাপাদাপি করছে। অসম সাহসিনী মাদ্রাজী-বউ এসব শোনা সত্ত্বেও হাসতে হাসতে সাঁতরে পুকুর পার হতে গিয়ে পায়ে ক্র্যাম্প ধরে—এবং তার ধারণা কেউ তার পা টেনে ধরেছিল।

আমাদের নীচের ফ্ল্যাটে থাকতো তপন, পোর্ট কমিশনে কাজ করে, ক্রিকেট খেলা চেহারা, 'রবীন্দ্রসঙ্গীত ও মুর্গীর মাংস রান্না' ওর জীবনের এই দুটি মাত্র নেশা, একদিন আমাকে ডেকে বললো,

কি আপনি যে আর পুকুরে স্নান করতে আসেন না, আপনিও ভয় পেলেন নাকি? স্বীকার করতে লজ্জা হল, তবু সত্যিই আমি ভয় পেয়েছিলাম। পুকুরটা আমার কাছে আবার কি রকম অচেনা হয়ে গেছে। পুরোনো কালো জল, সারাদিন আজকাল আর স্নানার্থীদের দাপাদাপি থাকে না বলে শান্ত ও গম্ভীর, দেখলেই আমার কি রকম রহস্যময় যেন মনে হয়। আমাদের বারান্দা থেকে দূরে পুকুরটা একটু একটু দেখা যায়। একদিন পড়ন্ত বিকেলে সেদিকে তাকিয়ে চমকে উঠেছিলাম। কিছুই দেখিনি, তবু চমকে উঠেছিলাম। কিছু একটা দেখবো এই প্রত্যাশা, অথবা অযৌক্তিক অলৌকিকের প্রতি আমার গোপন বিশ্বাস জন্মানোর লজ্জাতেই চমকে উঠেছিলাম হয়তো।

কাঁধে তোয়ালে, ব্রাশ দিয়ে দাঁত মাজতে মাজতে তপন আমাকে বললো, আসুন, নেমে আসুন।

আমি বললুম না, এখন বর্ষা নেমে গেছে, ঐ জন্যই আর পুকুরে যেতে ইচ্ছে হয় না আর কি।

যাঃ, এ আর কি এমন বর্ষা। আসুন, নেমে আসুন। আমি তো রয়েছি, ভয় কি!

শেষের কথাটাই আমার আত্মাভিমানে আঘাত দিল। যেতে হল। পুকুরে যাবার পথে তপন সদ্য দেখা কি যেন একটা সিনেমার গল্প বলতে লাগলো আমায়, জলে নেমেও সেই গল্প, কখন যে আমরা পুকুরটাকে ভুলে থেকে স্নান সেরে উঠে এলাম খেয়ালই নেই। এই রকম পর পর তিন দিন গেলাম, নির্দোষ সরল জল, কোথায় কোনো রহস্য নেই, আমরা দু'জন যুবক স্নান সেরে আসি। যদিও আমরা দুজনেই হয়তো মনে মনে লজ্জিত হয়ে ছিলাম একটা ব্যাপারে, আগে একবার অন্তত পুকুরটা সাঁতরে পার হয়ে আসতাম, এখন মাঝখান পর্যন্তও যাই না।

এরপর কয়েকদিন যাইনি, তিনদিন প্রবল ঝড় ও বৃষ্টি, স্নান না

করে বিছানায় শুয়ে শুয়ে খিচুড়ি খাবার দিন। হঠাৎ শুনতে পেলাম, তিনদিন ধরে তপন বাড়ি নেই। বাড়ির লোক কিছুই জানে না কোথায় গেছে। মেঘ সরে গিয়ে চতুর্থ দিনের রোদে আমরা তপনের জন্য সত্যিই ব্যস্ত হয়ে উঠলাম। এরকম না বলে কয়ে সে তো কোথাও যাবে না। ত্রিলোচনবাবু বললেন, পুলিশে খবর দাও হে, আর পুকুরে জাল ফেলো!

পুলিশে খবর দেওয়া হল, কিন্তু পুকুরে জাল ফেলতে হল না। তার আগেই তপনের মৃতদেহ ভেসে উঠলো। জলে ফুলে বীভৎস চেহারা। সেই প্রথম আমি মৃতদেহ দেখলাম, যাকে আমি জীবন্ত অবস্থায় চিনতাম। আমাদের পরিবারে তখনও কোনো মৃত্যু আসেনি। পুলিশ খুব পুলিশী কায়দায় জিজ্ঞেসবাদ করতে লাগলো সকলকে, প্রথমে ত্রিলোচনবাবুকে, আমরা সবাই বিষম অস্বস্তিতে রইলাম! এ কি ধরনের মৃত্যু তপনের, যাতে ওর সম্পর্কে শোক করার বদলে আমাদের নিজেদের সম্বন্ধেই উদ্বিগ্ন হতে হচ্ছে। অবশ্য, বেশীক্ষণ এ রকম রইলো না, তপনের মৃতদেহ পাওয়া গিয়েছিল সকালে, বিকালের দিকে তপনের বৌদি বুক শেল্‌ফের পিছন থেকে চিঠিটা খুঁজে পেলেন। চিঠিটায় তিনদিন আগের তারিখ দেওয়া, বোধ হয় ঝড়ে উড়ে পড়ে গিয়েছিল টেবিল থেকে। সেই মামুলি এবং অতি প্রয়োজনীয় চিঠি, 'আমার মৃত্যুর জন্য কেউ দায়ী নয়...।' আমরা সকলে নিশ্চিন্ত হয়ে তৎক্ষণাৎ তপনের সম্বন্ধে সত্যিকারের দুঃখিত হতে শুরু করলাম। যদিও তপনের রুচির প্রশংসা করতে পারিনি আমি, মরতে হলে কত ভদ্র উপায় আছে, ঘুমের ওষুধ, তার বদলে অমন বিশ্রীভাবে ডুবে মরা! তাছাড়া ডুবলোই বা কি করে, অমন ভালো সাঁতার জানতো!

যাই হোক, এর পর পুকুরটা সম্বন্ধে বদনাম কেটে যাওয়া উচিত ছিল, কারণ ওর মৃত্যুর জন্য জলের কোনো দোষ নেই। তা ছাড়া, জলের মধ্যের অদেখা জন্তু তো আর ওকে দিয়ে চিঠি লেখায় নি।

কিন্তু পুকুরটা হয়ে গেল সম্পূর্ণ পরিত্যক্ত। কেউ আর ওর ধারও মাড়ায় না, সাঁতার জানা সত্ত্বেও তপন ডুবে মরলো কি করে, এ রহস্যই সকলকে ভয় দেখায়।

অথচ, খুব সহজ। হয় তপন গলায় ভারী কিছু বেঁধে নিয়েছিল, তিনদিন পর সেটা ছিঁড়ে যেতে মৃতদেহ ভেসে ওঠে। অথবা··· অথবা, আর একটা কথা আমার বারবার মনে হতে লাগলো, হয়তো তপন ঝোঁকের মাথায় পুকুরের মাঝখানে ডুব দিয়ে দেখতে গিয়েছিল —কেন সেই ছেলেটার নাক ও কপাল কেটেছিল—তারপর মনে ভয় থাকার জন্যই হয়তো দম আটকে যায়, কিংবা কিছুতে জামা-কাপড় জড়িয়ে···কি জানি। আমার এই দ্বিতীয় সন্দেহটার কথা দু'একজনকে বলতেই তারা তৎক্ষণাৎ মেনে নিল এবং এটাই মুখে মুখে ছড়িয়ে গেল যে, পুকুরের মাঝখানে একটা ভয়ঙ্কর কিছু আছে— তপন সেটাই ডুব দিয়ে দেখতে গিয়ে মারা যায়। উল্টে আমিই তখন প্রতিবাদ করে বলি, তা হলে তপন চিঠি লিখলো কেন? কেউ সে কথা শোনে না। পুকুরটা সম্পর্কে চরম দুর্নাম ছড়াবার জন্য দায়ি হলাম আমিই।

তপনের মৃত্যুই আমাকে সাহসী করে দিয়েছিল। পুকুরটা সম্বন্ধে সব কুসংস্কারই তখন অবিশ্বাস করতে শুরু করেছি। অতদিনের পুকুর—ওর মধ্যে আবার জন্তু-জানোয়ার কি থাকবে? থাকলে কেউ না কেউ দেখতোই। বড়জোর মাঝখানে কোনো বাঁশ বা পাথরের টুকরো পোঁতা আছে। আমার ইচ্ছে হত এক একবার, আমিও খুব খারাপ সাঁতার জানি না, সাবধানে একবার ওখানে ডুব দিয়ে দেখে আসি, ওখানে কি আছে, তারপর লোকের ভুল ভেঙে দি।

তার বদলে আমরা ও বাড়ি ছেড়ে দিলাম। আমিই উদ্যোগী হয়ে খুব তাড়াতাড়ি খোঁজাখুঁজি করে, অমন খোলামেলা বাড়ি ছেড়ে চলে এলাম আবার করপোরেশন এলাকার মধ্যে। বাড়ির

লোক অবাক হয়ে গিয়েছিল আমার ব্যস্ততা দেখে· কিন্তু আমি সত্যিই ওখানে থাকতে চাইনি আর। জলের রহস্য জানতে আমার আর ইচ্ছে হয় না। এখন করপোরেশনের কলের ছিরছিরে জলই আমার ভালো লাগে।

ও বাড়িতে শেষ ক'দিন আমার ইচ্ছে হত পুকুরে স্নান করতে। মা দিতেন না কিছুতেই। অথচ, কুসংস্কার মেনে একটা নিরীহ পুকুরে স্নান না করার কি মানে হয়। আমি মাঝে মাঝে সন্ধেবেলা পুকুর-পাড়ে যেতাম। বাঁধানো ঘাটের ওপর বসে সিগারেট ধরাতাম। পুকুরের যেখানটায় তপনের দেহটা ভেসে উঠেছিল সেদিকে তাকালে কি রকম বিশ্রী উদাসীন লাগতো। হঠাৎ একদিন কান্নার শব্দ। দেখি ঘাটের পাশে মাঠের ঘাসে বসে একটি যুবতী মেয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে। তখন সন্ধের আবছা অন্ধকার। মেয়েটি বোধ হয় আমাকে দেখতে পায়নি। আমি তৎক্ষণাৎ সে জায়গা ছেড়ে উঠে এলাম· মেয়েটির মুখ দেখার চেষ্টাও না করে।

নিছক ভদ্রতা বোধে চলে আসিনি। ভয়ে! ভয় হয়েছিল, মেয়েটিকে যদি কোনো কারণে চিনতে পেরে যাই, যদি হঠাৎ মনে পড়ে তপনের মৃত্যুর সঙ্গে ওর কোনো সম্পর্ক—তা হলেই তো মহামুশকিল। পুকুরের জলের রহস্যের বদলে চোখের জলের রহস্য নিয়ে তখন আমাকে আবার মগ্ন হতে হবে। তা ছাড়া মেয়েটি যদি বলে, আপনি বিশ্বাস করেন, পুকুরের মাঝখানে কি আছে—এটা জানার জন্যই শুধু তপন মরেছে? আপনি একবার ডুব দিয়ে দেখে আসুন না! সর্বনাশ, এই রহস্য কিংবা রহস্য উন্মোচন করতে আমাকে কতদূর জটিলতায় চলে যেতে হবে ভাবতেই আমার ভয় হয়েছিল।

তারপরই ও বাড়ি থেকে চলে আসি। এখন জলের আর কোনো চেনা-অচেনা নেই। কোনো রহস্য নেই। কল দিয়ে কেঁচো বা সাপ বেরুলেও এখন আর নতুন বিস্ময়ে কিছু থাকবে না। সরু

জলের ধারায় আমার স্নান করার সময় পুরো শরীরটাও ভেজে না—কিন্তু তাতেও দুঃখ নেই তবু তো আমাকে কোনো জলের রহস্য ভেদ করতে হবে না।

সতেরো

মা জিজ্ঞেস করলেন, হ্যাঁরে, কাল শান্তাদের বাড়িতে গিয়েছিলি?

আমি বই হাতে, অন্যমনস্ক, তবু সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিলাম, হ্যাঁ। সিঁড়িতে পায়ের শব্দ পেয়েই বুঝেছিলাম মা আসছেন আমার ঘরে এবং এসে এই প্রশ্নটাই জিজ্ঞেস করবেন। মা তারপর আবার জিজ্ঞেস করলেন, কি বললো শান্তা?

বইয়ের সে পাতার একেবারে শেষ লাইনে এসে চোখ থমকে আছে, সুতরাং সেই লাইনটা না পড়ে উত্তর দেওয়া যায় না। শেষ করে, বইটা মুড়ে রেখে চোখ তুলে উত্তর দিলাম, শান্তামাসীর সঙ্গে দেখাই হলো না। বড় মেসো আর শান্তামাসী টালিগঞ্জ গেছেন শুনলাম, বাড়িতে আর কেউই নেই, ছোটকু বাথরুমে ছিল, আর নবনীতাকে দেখলুম তার প্রাইভেট টিউটর পড়াচ্ছে—তখন ওর সঙ্গে কথা বলা যায় না। তাই আমি বেশীক্ষণ না দাঁড়িয়ে চলে এলাম। আমার একটা কাজ ছিল।

—শান্তার শাশুড়ী ছিল না?

—দেখলাম না তো!

—আজ তাহলে একবার যাস্—

ততক্ষণে আমি আবার বইটা খুলেছি, পরের পাতার প্রথম লাইনে চোখ নিবদ্ধ, উত্তর দিলাম, হ্যাঁ, দেখি যদি পারি তো একবার যাবো আজ আবার—

—শান্তার টেলিফোনটা খারাপ—আমি ওর সঙ্গে কথা বলতে

পারছি না, তুই একটু জিজ্ঞেস করে আসিস আজ, ওর কি মত সেই বুঝে—

—যাবো, যাবো, বলছি তো সময় পেলে আজ যাবো—

আজ যে যাবো তা বহুক্ষণ আগে থেকেই আমি ঠিক করে রেখেছি, সিঁড়িতে মার পায়ের শব্দ পেয়েই যত কাজই থাক আজ যাবো। কেননা, কাল আমি সত্যিই যাইনি। ওটা মিথ্যে কথা। শান্তা-মাসীর মেয়ে নবনীতার সঙ্গে আমাদের পাশের বাড়ির দেবনাথের বিয়ের সম্বন্ধ মা প্রায় ঠিকঠাক করে ফেলেছেন। দেবনাথের বাবার চিনির কল আছে, দেবনাথ নিজেও জার্মানি থেকে ও ব্যাপারে ডিগ্রী নিয়ে এসেছে, বেশ লম্বা চওড়া চেহারা তার। খুবই সুপাত্র যাকে বলে। এ বিয়ে হলে শান্তামাসীও আনন্দে আটখানা হবে, আমারও আনন্দের কারণ আছে, স্যাকারিন দিয়ে চা খেয়ে খেয়ে জিভ তেতো হয়ে গেল, এ বিয়ে হলে নবনীতার শ্বশুরবাড়ি গেলে নিশ্চয়ই চিনি দেওয়া চা খাওয়া যাবে সব সময়। ও বাড়িতে নিশ্চয়ই প্রত্যেকদিন প্রতিবারের চা-তেই চিনি থাকে।

সেদিন সন্ধেবেলা সব কাজ ফেলে শান্তামাসীর বাড়িতে গেলুম। শান্তামাসী বাড়ি ছিলেন, সবাই বাড়ি ছিলেন, শান্তামাসী এই সম্বন্ধের কথা শুনে খুব খুশী—নবনীতাকে আমি বিয়ের কথা বলে রাগালুম। আমার আগের দিন না আসায় কোন ক্ষতি হয়নি, মায়ের কাছে আমার মিথ্যে কথা বলাটা ধরা পড়ারও কোনো সম্ভাবনা নেই। লাখ কথা না হলে বিয়ে হয় না, মা-মাসীতে এখন এত কথা হবে যে আগের দিন আমি গিয়েছিলুম কি যাইনি—সে প্রসঙ্গই উঠবে না। কিন্তু আমার মিথ্যে কথায় একটু খুঁত রয়ে গেল।

শান্তামাসীর বাড়িতে এর আগে গিয়েছিলাম মাস দুয়েক আগে, সেদিন ঘরভর্তি সবাই বসে গল্প করছিল, এমন সময় ঝি এসে নবনী-তাকে বললো, দিদিমণি তোমার মাস্টারমশাই এসেছেন। আড্ডার মাঝপথে নবনীতাকে উঠে যেতে হলো, শুনলাম পরীক্ষায় আগের

চার মাস ওকে ওদের কলেজের একজন অধ্যাপক বাড়িতে পড়াচ্ছেন—নবনীতা বরাবরই ইংরেজিতে একটু কাঁচা। সেদিন উঁকি মেরে দেখেছিলাম, আমারই বয়েসী অ্যাংরি ইয়ংম্যান টাইপের এক ছোকরা ওর সেই অধ্যাপক।

সুতরাং, মায়ের কাছে মিথ্যে কথা বলবার সময়, পরিবেশ ফোটাতে আমার বিশেষ অসুবিধে হয়নি। শান্তামাসীর ভাসুরের ক্যান্সার হয়েছে, তাঁকে দেখতে প্রায়ই ওঁরা টালিগঞ্জে যান। সুতরাং শান্তা-মাসীর টালিগঞ্জে যাওয়ার কথা শুনলে মা অবিশ্বাস করবেন না। ছোটকুর স্বভাব অফিস থেকে ফিরেই ঘণ্টাখানেক বাথরুমে কাটানো—দিনে তিন চারবার চান করা ওর বাতিক। আর সন্ধেবেলা নবনীতার অধ্যাপক তো পড়াতে রোজই আসে। শান্তামাসীর শাশুড়িও প্রায় রোজ বিকেলেই মহানির্বাণ মঠে কথকতা শুনতে যান। সুতরাং বইয়ের দিকে মনোযোগ দেবার অছিলায় আমি চট করে মিথ্যে কথাটা বানিয়েছিলাম। তবু একটা খুঁত রয়ে গেল। পরের দিন শান্তামাসীর বাড়িতে গিয়ে কথায় কথায় জানতে পারা গেল, দিন পনেরো আগে নবনীতার সেই অধ্যাপককে নাকি ছাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। নবীন অধ্যাপকটি উগ্র আধুনিক এবং উদ্ধত, বাড়ির সবার সামনে সিগারেট খায়, এমনকি স্বয়ং শান্তামাসীর বর অর্থাৎ আমার জবরদস্ত বড় মেসোর কাছে সে নাকি দেশলাই চেয়েছে—এই অপরাধে তার চাকরি গেছে। শান্তামাসী আমায় জিজ্ঞেস করলেন, আমি বুড়ো সুড়ো ধীর স্থির আর কোনো অধ্যাপককে জোগাড় করে দিতে পারি কিনা।

মায়ের কাছে আমার মিথ্যে কথাটায় এই একটা খুঁত থেকে গেল—নবনীতা প্রাইভেট টিউটরের কাছে পড়ছে। তা যাকগে, আসল কাজটা তো ঠিকঠাক হচ্ছে—সামান্য একটা মিথ্যে কথায় কি আসে যায়!

কিন্তু মায়ের কাছে ঐ মিথ্যে কথাটা আমি কেন বললুম? যদি

বলতুম, না মা, কাল শান্তামাসীদের বাড়িতে যেতে পারিনি, আজ যাবো—তাহলে কি এমন ক্ষতি হতো ? মা দু' তিন দিন ধরেই যেতে বলছিলেন, আমি রোজই যাবো যাবো করে পাশ কাটাচ্ছিলুম, সুতরাং তিন দিনের দিন ঐ মিথ্যে কথা এবং চতুর্থ দিনের দিন সত্যিই যাওয়া। কিন্তু তৃতীয় দিনেও ঐ মিথ্যেটা না বলাই তো আমার উচিত ছিল। তবু কেন ?

—তারপর ইন্দ্রনাথ স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেল।

—তাই নাকি ? তারপর ?

—প্ল্যাটফর্মে বিশেষ লোকজন নেই, কয়েকটা ছোকরা একদিকে জটলা করছিল—তাদের চেহারাও বিশেষ সুবিধের নয়—ইন্দ্রনাথের ঐ অতবড় জোয়ান শরীর আমার পক্ষে বয়ে নিয়ে যাওয়াও সম্ভব নয়—মাথায় জল ছেটানো দরকার—অথচ ওকে ফেলে রেখে যেতে পারছি না।

—কেন, তাতে কি হবে ?

—ইন্দ্রনাথের পকেটে চার হাজার টাকা ছিল, ও আমাকে আগেই বলেছিল—সুতরাং ওকে একা ফেলে যাওয়া, আর সেই ছোকরাগুলোর রকমসকম···

তখন কি করলি ?

—ইন্দ্রনাথের ওপর চোখ রেখে একটু দূরে ঘোরাঘুরি করে অতিকষ্টে একটা কুলিকে দেখতে পেলুম, ছোট স্টেশন তো···কুলিটাকে দিয়ে জল আনালুম এক বালতি···পৌনে দু' ঘণ্টা বসে থাকার পর পরের ট্রেন যখন এলো···

ইন্দ্রনাথ এবং আমার—দুজনের বন্ধু এমন একজনকে ঘটনাটা শোনাচ্ছিলাম। ঘটনাটি সবই সত্যি। ইন্দ্রনাথের একদিন সত্যিই খুব শরীর খারাপ হয়েছিল এবং অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিল রাত্রিবেলার

প্লাটফর্মে। কিন্তু বলার সময় কেন যে একটু বদলে গেল—কিছুই বুঝি না। ইন্দ্রনাথ বলেছিল ওর পকেটে দেড় হাজার টাকা আছে। দেড় হাজার টাকাও কম গুরুত্বপূর্ণ নয়, তবু সেটাকে বাড়িয়ে চার হাজার টাকা বলার ইচ্ছে আমার কেন হলো, আমি নিজেই জানি না। পরের ট্রেন এসেছিল আধঘণ্টা বাদে—আমি সেটাকে বাড়িয়ে করলুম পৌনে দু' ঘণ্টা। কেন? এমন কি আধঘণ্টার বদলে এক ঘণ্টা কি দু' ঘণ্টাও নয়, পৌনে দু' ঘণ্টা। ঘটনাটাকে বেশী গুরুত্ব দেবার জন্য এই মিথ্যের অবতারণা? পকেটে দেড় হাজার টাকা নিয়ে নির্জন প্ল্যাটফর্মে এক বন্ধুর অজ্ঞান হয়ে যাওয়াটাই তো যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা—তাকে আরও বাড়িয়ে আমার লাভ কি? তাহলে কি, সবসময় যা ঘটে—তারই পুনরুক্তি করতে একঘেয়ে লাগে বলেই এইসব নির্দোষ মিথ্যে বলতে সাধ হয়?

রতনটা একেবারে বাজে ছেলে। কোনো কথা দিয়ে কথা রাখে না—বড়বৌদি বললেন।

—অফিসেও কেউ ওকে গ্রাহ্য করে না শুনেছি। মুখেই শুধু লম্বাচওড়া কথা, কাজের বেলা কিছু না—এবার ছোটবৌদি।

পারিবারিক মহলে আমার মামাতো ভাই রতনের খুব নিন্দে হচ্ছিল। আমার ঠিক সহ্য হচ্ছিল না। রতনকে আমার খুব ভালো লাগে, চমৎকার দিলখোলা মানুষ, সরলভাবে হা-হা করে হাসে, কি চমৎকার গান গায়। রতনের দায়িত্বজ্ঞান একটু কম, সময়ের ঠিক রাখে না, কথা দিয়ে কথা রাখতে পারে না—কিন্তু একই মানুষ ভালো গান গাইবে, আবার সময়েরও ঠিক রাখার আদর্শ দায়িত্বপালন হবে—এতটা আশা করা যায় না। রতনের আমি ভক্ত। সুতরাং আমি প্রাণপণে বৌদিদের নিন্দের প্রতিবাদ করতে লাগলুম। কিন্তু বৌদিরা ওসব গান টানের দিকেই যাচ্ছেন না। শুধু ঐ দায়িত্ব-জ্ঞানটার

ওপরই সব জোর। তখন আমি বললুম, রতনের দায়িত্বজ্ঞান নেই কে বললো? গত বছর সেই যে আমরা পুরী গেলাম—রতনই তো আমাদের বাড়ি ঠিক করে দিল!

বড় বৌদি বললেন, রতন বাড়ি ঠিক করে দিয়েছে? আমি বিশ্বাস করি না। আমি বললুম, সত্যিই! রতনের কথাতেই তো আমরা দীঘা না গিয়ে পুরী গেলুম। রতন বাড়ি ঠিক করে দেবে বলেছিল—আমিও প্রথমটায় ঠিক বিশ্বাস করিনি—কিন্তু রতন ওর এক বন্ধুকে চিঠি লিখে রেখেছিল—স্বর্গদ্বারে চমৎকার বাড়ি—ভাড়া লাগলো না—এমন কি পৌঁছে দেখলুম আমাদের জন্য খাবার দাবার রেডি। রতনের অফিসের ম্যানেজারের বাড়ি—

—সত্যি বলছো?

রতনের নিন্দে থামাবার জন্য রতনের দায়িত্বজ্ঞানের এই কাহিনীটা বলার প্রেরণা আমার ভেতর থেকেই কে যেন আমায় দিয়ে দিল। ঘটনার কাঠামোটা তো সত্যিই। আমরা ঠিকই পুরী গিয়েছিলাম, রতন ছিল আমাদের সঙ্গে—ঠিক করেছিলাম, কোনো হোটেলে থাকবো। কিন্তু স্টেশনেই রতনের অফিসের ম্যানেজারের সঙ্গে দেখা হলো—তিনি কলকাতায় ফিরছেন সপরিবারে। তিনিই উৎসাহিত হয়ে বললেন, স্বর্গদ্বারে একটা বাড়ি তিনি অ্যাডভান্স টাকা দিয়ে দু'মাসের জন্য ভাড়া নিয়েছিলেন। কিন্তু বিশেষ কারণে এক মাসের পরই তিনি ফিরে যাচ্ছেন—সুতরাং সেই বাড়িতে আমরা অনায়াসে একমাস থাকতে পারি। বাকি অংশটা রং চড়ানো হলেও রতনের জন্যই তো আমরা বাড়িটা পেয়েছিলাম।

ছোট বৌদি বললেন, সত্যি, রতন পুরীতে বাড়ি জোগাড় করে দিতে পারে নাকি—আমার দাদা-বৌদি পুরী যাবেন বলেছিলেন—তা হলে রতনকে বলতে হবে তো!

আমার মাথায় আকাশ ভেঙে পড়লো। সর্বনাশ, এদিকটা তো আমি ভেবে দেখিনি! আজ বিকেলেই রতনের কাছে ছুটতে হবে।

রতনের প্রশংসা করতে গিয়ে আমিই তার বিপদের কারণ ঘটালুম।

এইসব অকারণ মিথ্যে অকারণেই অনেক সময় ধরা পড়ে যায়। প্রথম ঘটনায় আবার ফিরে আসি। শান্তামাসীর বাড়ীর টেলিফোন আবার ঠিক হয়ে গেল, আমার আর দায়িত্ব রইলো না কিছুই। নবনীতার বিয়ে আমার মায়ের উদ্যোগেই প্রায় ঠিকঠাক। এমন সময় একদিন মা ট্যাক্সিতে আসতে আসতে দেখলেন, কলেজের রাস্তায় নবনীতা আরও দুটি মেয়ে এবং তিনটি ছেলের সঙ্গে খুব হাসি-গল্প করছে। এতে মনে করার কিছু নেই—আজকালকার কলেজের মেয়েরা বাইরে ছেলেদের সঙ্গে মিশবে, গল্প করবে—এ তো স্বাভাবিক। মা বাড়ি ফিরে হাসতে হাসতেই বললেন, নবনীকে রাস্তায় দেখলুম, খুব বন্ধুদের সঙ্গে গল্প করছে, আমি আর ডাকিনি। তারপর মা শান্তামাসীকে ফোন করলেন—এ কথা সেকথা সাত কাহনের পর মা জিজ্ঞেস করলেন, নবনীতা বাড়ি ফিরেছে কিনা। ফিরেছে শুনে মা টেলিফোনেই ফিসফিসিয়ে বললেন, ছাখ শান্তা, নবনীকে যখন মাস্টার এসে পড়ায়—তখন তোরা সবাই বাড়ি ছেড়ে চলে যাস্ না! আজকালকার ছেলেমেয়ে—যতই ভালো হোক···নবনী অবশ্য সোনার টুকরো মেয়ে—কিন্তু বলা তো যায় না—কখন কি বিপদ হয়ে যায়—খবরের কাগজে যা এক একখানা মাঝে মাঝে বেরোয়।

—শান্তামাসী অবাক হয়ে বললেন, নবনীকে তো এখন আর কেউ পড়ায় না।

—কেন এই যে নীলু দেখে এলো গত সোমবার?

—গত সোমবার? অসম্ভব।

—হ্যাঁ, নীলু নিজের চোখে দেখে এসেছে—সেই মাস্টার নবনীকে পড়াচ্ছে, তোরা তখন টালিগঞ্জে গিয়েছিলি—

তারপর কোথাকার জল কোথায় গড়ায়। আবার সেই দৃশ্য, আমি আমার ঘরে, হাতে বই, আমার সামনে রাশিয়া, আমেরিকার মতন দুই বিশাল শক্তি, মা আর মাসীমা। শান্তমাসীঃ নীলু,

তুই নিজের চোখে দেখেছিলি? মা: তুই না দেখে থাকলে শুধু শুধু কেন মিথ্যে কথা বললি? আমি আর কি উত্তর দেবো? কোনো যুক্তি নেই, কোনো উদ্দেশ্য নেই—আমি যে এমনিই বলেছিলাম—সে কথা তো ওঁদের বলা যায় না! সুতরাং বোকার মতন ক্যালক্যাল করে হাসতে হাসতে বললুম, কি যে হয়েছো তোমরা, একটু ইয়ার্কিও বোঝ না।

আঠারো

বৈচু রক্ষিত নামে একজন লোক কেষ্টনগর থেকে কলকাতায় আসছিলেন তাঁর ভগ্নিপতির বাড়িতে। ট্রেনে ওঠবার আগে চার টাকার সরপুরিয়া-সরভাজা কিনে নিয়েছেন দিদি জামাইবাবুর জন্য। কলকাতায় তো আর দুধ-ক্ষীরের জিনিসপত্র পাওয়া যায় না, তাই কেষ্টনগরের নামকরা মিষ্টি নিয়ে চলেছেন ওদের খুশী করতে।

ব্যাপারটার শুরু এইখান থেকে। বেচু রক্ষিত মিষ্টির হাঁড়িটা বাক্সের ওপর সুটকেশ-বিছানার পাশে লুকিয়ে রেখে নিশ্চিন্তে ঘুম দিয়েছেন। এক ঘুমে কলকাতা। শিয়ালদা স্টেশনে পৌছেই ধড়মড় করে উঠে প্রথমেই তিনি খোঁজ নিয়েছেন মিষ্টির হাঁড়ির। না, কেউ চুরি করেনি, কেউ খোলেওনি। কিন্তু হাঁড়িটার ওপর দুটো নীলরঙের ডুমো-ডুমো মাছি বসে আছে। ওরা সেই কেষ্টনগর থেকেই হাঁড়ির মধ্যে রসের খোঁজ পেয়ে হাঁড়ির গায়ে লেগে আছে। বিরক্ত হয়ে বেচু রক্ষিত হাতের ঝাপটায় মাছি দুটোকে তাড়িয়ে বললেন যাঃ যাঃ! মাছি দুটো একটু ভন ভন করে উড়লো আশেপাশে তারপর হাতের ঝাপটার ভয়ে দূরে দূরে রইলো।

গাড়ি থেকে নেমে কাঁখালে সতরঞ্চি মোড়া বেডিং, বাঁ-হাতে টিনের সুটকেশ ও ডান হাতে মিষ্টির হাঁড়ি নিয়ে বেচু রক্ষিত শেয়ালদা স্টেশন থেকে এবং আমাদের এই কাহিনী থেকে বেরিয়ে গেলেন।

কেষ্টনগরের সেই নীল ডুমো মাছি দুটো ভন্ ভন্ করে ওড়াউড়ি শুরু করে পরস্পরকে বললো, এ আবার কোথায় এলুম রে? চল, ভালো করে আগে জায়গাটা দেখে নেওয়া যাক! এই বলে, হাওয়ায় ভাসতে ভাসতে তারা বেশ খানিকটা উঁচুতে উঠে গেল। মাছি দুটি যুবক ও যুবতী। যুবক মাছিটি একটু চালিয়াৎ গোছের, সে বললো, বুঝেছি, এ জায়গাটার নাম নবদ্বীপ। যুবতী মাছিনী বললো কি করে বুঝলে?

—একবার নবদ্বীপের এক মাছিনীর সঙ্গে আমার দেখা হয়েছিল, সে বলেছিল, ওঃ, নবদ্বীপে একেবারে···

—বুঝেছি, সেই যে-মাছিনীটাকে পেয়ে তুমি আমাকে ছেড়ে কয়েকদিন···

—আর তুমি বুঝি তখন···

—যাক, আর ভ্যানভ্যান করতে হবে না···

যাই হোক, ওরা দু'জনে উঁচু থেকে খানিকক্ষণ ঘোরাঘুরি করেই বুঝে ফেললো, ওরা কলকাতা শহরে এসেছে। কেষ্টনগরের আসল দুধ-ক্ষীর খাওয়া মাছি তো, বুদ্ধি বেশ পরিষ্কার। কলকাতা শহরকে চিনতে পেরে ওরা একেবারে আহ্লাদে আটখানা। মাছি মাছিনীকে বললো, আর ঝগড়া করিসনি। আজ জীবনটা সার্থক হলো। কলকাতা শহরের কত নাম শুনেছি, কোনোদিন কি স্বপ্নেও ভাবতে পেরেছিলুম এখানে আসতে পারবো? কেষ্টনগরের মিষ্টি খেয়ে খেয়ে মুখ পচে গেছে, এখানে ওসব মিষ্টি-ফিষ্টির পাট নেই, এখানে খুব ভালো ভালো নোংরা, আস্তাকুড় আর জঞ্জাল আছে।

মাছিনী বললো, ছাখো না নীচে, কত মাছি গিস্‌গিস্ করছে। কত দেশ থেকে মাছি আসে এখানে—ছাখো, রাস্তা-ঘাট একেবারে ভরা!

কিন্তু নীচে নেমে এসে দেখলো, একটাও মাছি নেই, সব মানুষ। মাছি দুটো খুব মুস্কিলে পড়লো, সারা শহরে আর একটাও মাছি নেই,

এমন কি মশা কিংবা পিঁপড়ে এইসব ছোট জাতের প্রাণীও নেই। সব মানুষ। কলকাতার আকাশে মাত্র এই তুটো মাছি, অনেক লোক ওদের দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে দেখতে লাগলো। একটা বাচ্চা ছেলে বললো, বাবা, ও তুটো কি চড়ুই পাখির বাচ্চা। বাবা উত্তর দিলেন, না, ওদের বলে মাছি, মফস্বল থেকে হঠাৎ এসে পড়েছে বোধ হয়। এই নিয়ে কাগজে একটা চিঠি লিখতে হবে তো!

সব কটা রাস্তা ধপধপে ঝকঝকে, কোথাও এক ছিটে ময়লা নেই, কোথাও জঞ্জাল জমে নেই, মাছি তুটো পড়লো মহামুস্কিলে। ঝাড়ু-দারেরা অনবরত রাস্তা সাফ করছে, ধুয়ে দিচ্ছে, নোংরা জমাবার কোনো সুযোগই নেই। এ কি আর কেষ্টনগর, ময়রার দোকানের সামনের ভাঙা ভাঁড়গুলোতে যা রস জমে থাকে তাতেই কত মাছির সংসার চলে যায়। ঝাড়ুদাররা দিনে মাত্র তু'বার ঝাঁড় দেয় কি না দেয়। আর এ কলকাতা শহর, এখানে প্রত্যেক দোকানে কাচের বাকস দিয়ে জিনিসপত্র ঢাকা, প্রত্যেক বাড়ির লোকেরা মুখ বন্ধ টিনের বাকসের মধ্যে ময়লা জমা রাখে, মেথররা অনবরত এসে সেগুলো পরিষ্কার করে নিয়ে যাচ্ছে।

মাছি মাছিনীকে বললো, শেষকালে কি এখানে এসে না খেয়ে মরবো নাকি?

মাছিনী বললো, চল্‌ না, মাছের বাজারে যাই, সেখানে তো মাছের কানকো নাড়িভুঁড়ি ফেলবেই?

ঘুরতে ঘুরতে এলো মাছের বাজারে। মাছের বাজার ধোয়া-সাফ, কিচ্ছু নেই, মাছওলা মেছুনীরা বসে বসে কীর্তন গাইছে খোল করতাল বাজিয়ে। নিরাশ মাছিনী সঙ্গী মাছিকে বললো, আম-জামের সময় হলে রাস্তায় অন্তত তু'একটা আমের খোসা ঠিকই পড়ে থাকতো। ক্ষিদে পেয়ে মাছির শরীর তুর্বল হয়ে গেছে, তার গলার আওয়াজ এখন ভনভনের বদলে পিনপিন, সে বললো, এ শহরকে কিছু বিশ্বাস নেই! তা ও হয়তো সঙ্গে সঙ্গে পরিষ্কার করে ফেলে।

আমের সময় না হোক, কলার তো সময়! রাস্তায় একটাও কলার খোসা দেখলি?

সত্যিই! এ শহরের লোকেরা কলা খায় না নাকি?

—খাবে না কেন? বোধ হয় খোসা শুদ্ধ খায়!

—মাছিদের জন্যএকটু দয়ামায়াও নেই!

ঘুরতে ঘুরতে এলো একটা বিরাট বাড়ির সামনে, যাকে বলে, রাইটার্স বিল্ডিং! মাছি মাছিনী একেবারে বেপরোয়া হয়ে গেছে, ভালো ভালো ময়লার বদলে ওরা এখন থুতু-কফ খেতেও রাজী। সেখানে গিয়েও ওরা অবাক। মাছি মাছিনীকে বললো, হ্যাঁরে, কলকাতার বদলে কি আমরা ভুল করে বিলেতে চলে এলুম? মাছিনী বললো, সত্যি মানুষগুলো এমন নিষ্ঠুরও হয়! রাইটার্স বিল্ডিংয়ের কোথাও এক ছিটে ময়লা নেই, দেয়ালে পানের পিক নেই, সিঁড়ির পাশে সিক্নি নেই, আলুর দমের ঝোল মাখানো একটি শাল পাতাও নেই পর্যন্ত। ঝকঝকে তকতকে সব কিছু, লোকগুলো নিঃশব্দে কাজ করে মাঝে মাঝে উঠে থুতুটুতু ফেলার জন্য বারান্দায় গিয়ে থুক্ না করে বাথরুমে গিয়ে ঢুকছে, আবার বেরিয়ে এসে সযত্নে বাথরুমের দরজা বন্ধ করে দিচ্ছে। এরা কি মানুষ? মানুষ এমন হৃদয়হীন হয়?

মাছি বললো, চল, এখানকার মানুষেরা কিছুতেই ময়লা থাকতে দেবে না বুঝেছি। দেখি কোথায় এমন জায়গা আছে কি না— যেখানে মানুষ নেই, সেখানে যদি আপনি আপনি ময়লা-টয়লা কিছু থাকে। কিন্তু কলকাতার লোক এমন বোকা নয় যে, ফাঁকা জায়গা রাখতে দেবে। কোথায় মানুষ নেই? মাঝে মাঝে পার্ক-ময়দান তাও মানুষ দখল করে রেখেছে, সব জায়গা মানুষ বসে বসে পাহারা দিচ্ছে, যাতে কেউ নোংরা না করে ফেলে।

নাঃ, মাছি দুটো ভাবলো, মানুষকে আর বিশ্বাস নেই। এবার জন্তু-জানোয়ারের খোঁজ করা যাক। হ্যাঁরে, এ শহরে কি বেড়াল

ছানা মরে না? কুকুর গাড়ি চাপা পড়ে না? তাদের মরা দেহগুলো কোথায় যায়? রাস্তায় একটাও তো নেই! মোষের গাড়ির মোষের কাঁধে ঘা পর্যন্ত নেই, ব্যাপার কি? মাছি মাছিনীকে বললো, বুঝলি, এ সবই আমাদের না খাইয়ে মারবার ষড়যন্ত্র!

মাছিনী বললো, চল্, প্রাণ থাকতে থাকতে এ শহর থেকে পালাই! আমাদের কেষ্টনগর এর থেকে ঢের ভালো ছিল।

এই জন্যই এ শহরে মিষ্টি বন্ধ করেছে, বুঝলি? যাতে আর কোনো জায়গা থেকে মাছি না আসে! মিষ্টির গন্ধ পেলে দেশবিদেশ থেকে মাছি তো আসতোই!

—মিষ্টি কে চাইছে? একটু পচা জঞ্জালও রাখতে নেই আমাদের জন্য। চারপাশের এত বড় বড় বাড়ি মাঝখানে একটু ফাঁকা মতন জায়গা ভাল করে ওরা লক্ষ্য করে দেখলো, ঠিক ফাঁকা নয়, ছোট ছোট ঘরের মতন। মাছিনী আহ্লাদে বললো, চল্, ঐখানে যাই, ঐ ছোট ছোট ঘরগুলো নিশ্চই মানুষের নয়, ওখানে জন্তুরা থাকে। জন্তুরা তো নিজেদের ময়লা লুকোতে পারবে না।

ওপর থেকে নীচে নেমে এলো আবার। কোথায় জন্তু-জানোয়ার? একটা বস্তি—এখানেও মানুষ। আর কি আদর্শ বস্তির আদর্শ মানুষ! পরিষ্কার নিকানো ঘরগুলো, অনেক ঘরের সামনে আবার আল্পনা দেওয়া, পরিচ্ছন্ন আবহাওয়া, নর্দমা দিয়ে যে জল বইছে, তা পর্যন্ত পরিষ্কার! ছোট ছোট ছেলেরা পর্যন্ত নাকের সিক্নি ফেলে রাস্তা নোংরা করার বদলে নিজের সিক্নি নিজেই খেয়ে ফেলছে!

—মাছিনী, আজ আর বাঁচার আশা নেই

—এই নাকি কলকাতা? এই শহরের এত নাম ডাক? দূর দূর···

—গুজব! মাছি-সমাজে যে বলে কলকাতা একেবারে স্বর্গের মতন, যেখানে সেখানে ময়লা-নোংরা ছড়ানো, এবার বুঝলি তো,

সব গুজোব! কলকাতা না দেখেই কলকাতা সম্বন্ধে যত গল্প! বিলেত না গিয়েই বিলত ফেরৎ।

বিকেলের দিকে মাছি দুটো একেবারে করপোরেশনের অফিসে গিয়ে উপস্থিত। স্বয়ং নগরপালের ঘরে গিয়ে তাঁর নাকের সামনে ভন্ ভন্ করতে লাগলো। নগরপাল আঁৎকে উঠে বললেন, কি? আমার শহরে মাছি? তাজ্জব কাণ্ড! কে কোথায় আছিস্?

একদল লোক ছুটে এলো. সবাই মিলে তাড়া করতে লাগলেন. মাছি দুটোকে। কোথা থেকে দুটো উট্‌কো মাছি শহরে ঢুকে পড়েছে. এই নিয়ে কলকাতার নামে কলঙ্ক রটে যাবে। কাল না এ খবর আবার কাগজে বেরিয়ে যায়। মারো. মারো!

মাছি দুটো কিন্তু ভয় পেয়ে বেরিয়ে গেল না। নগরপালের কাছাকাছি উড়তে লাগলো। ক্ষুধা-তৃষ্ণায় ওরা একেবারে মুমূর্ষু. সারাদিন কোথাও একটু বসারও জায়গা পায়নি, গায়ের সেই চিক্কণ নীল রং মলিন হয়ে গেছে, গলার আওয়াজ প্রায় শোনাই যায় না, ওরা মরীয়া হয়ে নগরপালের মুখের সামনে ঘুরে ঘুরে কাতরভাবে অভিযোগ জানাতে লাগলো. অন্যায়। এ আপনার অন্যায়, বিদেশ বিভুঁই থেকে দু'একটা পোকা-মাছি এখানে বেড়াতে এলে—তাদের জন্য আপনি কোনো ব্যবস্থাই রাখেননি? শহরের কোনো একটা জায়গায় অন্তত একটুখানি ময়লা তাদের জন্য রাখা উচিত ছিল। সারা শহর ঘুরে দেখলুম. কোথাও এক ছিটেও ময়লা নেই। এ আপনার অন্যায়। আমাদের মেরে ফেলতে চান। এ রকম করলে কলকাতায় বেড়াতে আসবে কি করে, অ্যাঁ? আমরা আর কতখানি খাবো, অন্তত এক রত্তি ময়লাও যদি রাখতেন—

উনিশ

জামাটা পিঁজে গেছে, কলারের পাশ দিয়ে বেরিয়ে পড়েছে আঁশ, কাঁধের পাশে সামান্য ফাটতে শুরু করেছে, ডান হাতের কনুই-এর কাছটায় একবার সেলাই করা· তবু জামাটা ফেলতে মায়া হয়। নীল-সাদায় ডোরাকাটা আমার জামাটার বয়েস পাঁচ বছর পূর্ণ হলো, এবার ওকে তোরঙ্গের নীচে নির্বাসন দেবার কথা· কিংবা আগামী বছরের দোল খেলার জন্য জমিয়ে রাখা, কিংবা বাসনওয়ালীদের রুক্ষ হাতে সমর্পণ করলেও হয়, কিন্তু কিছুতেই জামাটাকে বিদায় দিতে আমার ইচ্ছে করে না, নরম মোলায়েম স্পর্শ দিয়ে সে আমার শরীরের সঙ্গে লেগে থাকে। ডায়িং-ক্লিনিং-এ পাঠালে পাছে ওর সর্বস্বান্ত হয়ে যায়, তাই আমি ওকে নিজেই সাবধানে বাড়িতে কেচে নিই। এখন শীতকাল কোট বা সোয়েটারের নীচে পরলে ওর ছেঁড়া অংশ আর তেমন চোখে পড়ে না, কিন্তু বুকের কাছাকাছি থাকে।

জামাটাকে বিসর্জন দেওয়া মানেই তো কত স্মৃতি নষ্ট করা। অনেক জামা-কাপড়ের মধ্যে কোনো একটার প্রতিই অনেক সময় বেশী মায়া পড়ে গত পাঁচ বছরে আমার কত জামা ছিঁড়লো, হারালো,—কিন্তু এই নীল-সাদায় ডোরাকাটা জামাটাই আমার প্রাণের বন্ধু।

মনে পড়ে পাঁচ বছর আগে নতুন এই জামাটা কিনে দুমকায় বেড়াতে গিয়েছিলুম। রামপুরহাট থেকে বাসে যাবার পথে প্রথম শীতের অবসন্ন আলোর সন্ধ্যায় কোনো একটা কারণে হঠাৎ আমার খুব মন খারাপ হয়ে যাবার পর চোখে পড়েছিল ছোটখাটো দু' চারটে পাহাড় অবোলা জন্তুর মতন রাস্তার খুব কাছেই দাঁড়িয়ে আছে।

আমি হিমালয় অভিযাত্রী সংঘের সদস্য কোনোদিনই হবো না, কিন্তু প্রায়ই আমার কোনো পাহাড় চূড়ায় উঠতে ইচ্ছে করে। ইচ্ছে করে কোনো পাহাড়ের শিখরে একা উঠে উড়িয়ে দিই আমার নিজস্ব পতাকা। সেদিন হাতের কাছেই অতগুলো চমৎকার শান্তশিষ্ঠ পাহাড় দেখে আমার খুব লোভ হচ্ছিল। এই নীল-সাদা ডোরাকাটা জামাটাকে আমি সেদিন পতাকা করে উড়িয়েছিলাম।

সেই বাসে চারজন প্রেসিডেন্সি কলেজের ছাত্রী ছিল : কি ঝক-ঝকে কথা আর খুনসুটি হাসি তাদের, কার না ইচ্ছে হয় ওদের সঙ্গে একটু ভাব জমাতে, সংক্ষিপ্ত প্রবাসের দিনগুলো রঙ্গরসে ভরাতে। কিন্তু আমি হেরে গেলুম, যেমন অনেক খেলাতেই হেরে যাই। বাস ছাড়ার আধ ঘণ্টার মধ্যে একটি মেয়ের ভ্যানিটি ব্যাগ পড়ে গিয়েছিল, আমি শশব্যস্তে সেটা তুলে দিয়ে ভূমিকা পর্যন্ত সেরে রেখেছিলুম। মেয়েটি আমার দিকে মৃদু হেসে বলেছিল, ধন্যবাদ! আরও আড়াই ঘণ্টা এক সঙ্গে যেতে হবে—মাঝপথে ওদের জন্য চা এনে দিয়ে কিংবা অন্য কোনো ছলে ওদের সঙ্গে আলাপ জমাবার পরিকল্পনায় মশগুল ছিলুম। কিন্তু শেষ পর্যন্ত আমি হেরে গেলাম। মেয়ে চারটি তাদের কাচ ভাঙা কণ্ঠস্বরে প্রেসিডেন্সি কলেজ লেকে সাঁতারের ক্লাব, নিউ মার্কেটে কোন্ কোন্ চিত্রাভিনেত্রীকে নিয়মিত দেখা যায়,—এই সব আলোচনায় বিভোর হয়েছিল। আমি মন দিয়ে ওদের কথা শুনছিলুম, ওদের মুখের রেখায়, হাসির ভঙ্গি, শাড়ির ভাঁজ—এবং মেয়েদের আরও যা-যা দেখার শুধু তাই দেখছিলুম, তখন জানালার বাইরে তাকাইনি, পাহাড় কিংবা জঙ্গল দেখিনি, প্রকৃতি দেখার সময় ছিল না। চোখের সামনে জ্যান্ত প্রকৃতি থাকতে কে আর বন-জঙ্গল দেখতে চায়। হঠাৎ ওদের মধ্যে একজন তার হাতের কব্জী তুলে বললো, ইস্, ঘড়িটা বোধ হয় বন্ধ হয়ে গেছে! অনুরাধা, তোর ঘড়িতে কটা বাজে রে?

চারটি মেয়েরই হাতে ছোট জুলজুলে ঘড়ি, কিন্তু দেখা গেল

চারজনের ঘড়িতে চাররকম সময়। তাই তো স্বাভাবিক। ওরা তন্বী, ওরা যুবতী ও সৌভাগ্যবতী—ওরা চারজনই আলাদা আলাদা সময় ভোগ করবে—তাই তো স্বাভাবিক। কিন্তু ওরা সঠিক সময় জানার জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠলো। ওরা সময় নিয়ে কলহ করে কালহরণ করতে লাগলো। অনুরাধার ধারণা তার ঘড়িটাই ঠিক, কিন্তু রুচিরা বলছে তার ঘড়ি রেডিও মেলানো। পরিমিতার দৃঢ় বিশ্বাস তার ঘড়ি কখনো এক সেকেণ্ডও শ্লো-ফাস্ট হয় না—আর দময়ন্তীর ঘড়ি তো থেমেই আছে—ধুক্ ধুক্ শব্দও নেই। মোটমাট ওদের পরস্পরের ঘড়িতে পাঁচ থেকে আধ ঘণ্টা সময়ের তফাৎ। শেষ পর্যন্ত কার ঘড়িতে ঠিক সময়—তা জানার জন্য ওরা পরস্পরের মধ্যে বাজি রাখলো। রুচিরা বললো, অন্য কারুর ঘড়িতে ছাখ তাহলে কটা বাজে।

মেয়েদের সবচেয়ে কাছের সীটে আমি বসে আছি। আমার ফুলহাতা নীল-সাদা ডোরাকাটা জামাটায় কব্জি পর্যন্ত বোতাম আঁটা। ওরা আমার দিকে আলতোভাবে তাকিয়ে পরোক্ষে প্রশ্ন করলো, কটা বাজে? কিন্তু আমার সঙ্গে ঘড়ি নেই, আমি ঘড়ি হাতে দিই না। সময়কে অত নিখুঁতভাবে জানার কোনো ইচ্ছে আমার নেই। আলোর যেমন সাতটা রং, সেই রকম ভোর, সকাল, দুপুর, বিকেল, সন্ধে, রাত্রি, গভীর রাত্রি—এই সাতটা বেলা আমি খালি চোখে দেখতে পাই—এতেই আমার কাজ চলে যায়। কিন্তু মেয়েগুলোর সঙ্গে আলাপ করন এই তো সুযোগ। ঘড়ি নেই শুনলে ওরা কি আর আমায় পাত্তা দেবে? আমার বেশ-ভূষা দেখে ওরা ধরেই নিয়েছে—আমার যখন চোখ, কান, নাক সবই ঠিক আছে—তখন হাতে ঘড়িও আছে—তাই তো থাকে। সুতরাং আমি স্মার্ট হবার জন্য বললুম, আপনাদের ঘড়ির সময়গুলো যোগ করে চার দিয়ে ভাগ দিন—তাহলেই ঠিক সময় পেয়ে যাবেন।

মেয়েদের কোনো উত্তর দেবার সুযোগ না দিয়েই আমার পাশের

সীট থেকে একজন যুবা বলে উঠলো—এখন ঠিক চারটে বেজে সাত-চল্লিশ! যুবকটি আস্তিন গোটানো কব্জি উঁচু করে ঘড়িটা চোখের সামনে তুলে ধরেছে—ঘড়িটার চেহারাই এমন ইম্পেসিভ যে দেখলেই মনে হয়—ওরকম ঘড়ি সময় দিতে পারে না! যুবকটি তবুও তার সঙ্গীকে জিজ্ঞেস করলো, কী রে বরুণ, তোর ঘড়িতে কটা বাজে? সঙ্গী উত্তর দিল, ঠিক ঐ চারটে বেজে সাতচল্লিশই। রুচিরা সঙ্গে সঙ্গে চেঁচিয়ে উঠলো, দেখলি, বলেছিলাম না, আমারটাই—

যুবক দুজনের নিখুঁত পোশাক চুল ও জুতো সমান ঝকঝকে এবং ওদের হাতে সঠিক সময়। ওরাই জিতে গেল। যুবক দুজনের একজন ঐ মেয়েদের মধ্যে একজনের দিকে তাকিয়ে বললো, আচ্ছা, আপনি কি প্রশান্ত-র বোন? সেই মেয়েটি সঙ্গে সঙ্গে উদ্ভাসিত মুখে বললো, হ্যাঁ, আপনি আমার দাদাকে চেনেন বুঝি? যুবকটি বললো, হ্যাঁ, চিনি, মানে আপনার দাদার এক বন্ধু আমার খুব বন্ধু, সেই হিসেরে একবার···আমার বন্ধুর নাম সিদ্ধার্থ মিত্র। রুচিরা বলে উঠলো, ও সিদ্ধার্থ-দা? হ্যাঁ, হ্যাঁ—

সব মিলে যাচ্ছে। এরপর আর কথার অভাব হয় না—যুবক দুটির সঙ্গে মেয়ে চারটি প্রচুর ভাব বিনিময় করতে লাগলো! আমি একেবারে হেরে গেলুম। আমার দিকে ওরা ফিরেও চাইলো না। বিষণ্ণ মুখে আমি প্রকৃতি দেখা শুরু করলুম জানলা দিয়ে।

সূর্য সবে ডুবছে, ডিমের কুসুম-লাল একদিকের আকাশ। চওড়া পথে শুধু আমাদের বাসটা একমাত্র ছুটছে, মাঝে মাঝে ধাবমান গাছ, দূরে-কাছে দু-একটি টিলা। খারাপ হলেই প্রকৃতিকে বেশী ভাল লাগে সন্দেহ নেই। মেয়ে চারটিকে ক্রমশ আমার অসহ্য লাগতে লাগলো—মনে হলো, হালকা প্রগলভা, ফচকে মেয়ে সব—সময়ের মর্ম বোঝে না—তবুও হাতে ঘড়ি পরা চাই! আর ক্রমশই আমি পথের পাশের নীরব দৃশ্যে মুগ্ধ হয়ে যেতে লাগলুম।

বাস থামলো এক জায়গায়। চা খেতে নেমে আমি কণ্ডাক্টরকে

জিজ্ঞেস করলুম, এরপর আরও বাস আছে ? সে বললে, অনেক অনেক। সেই বাসটা যখন আবার ছাড়লো—আমি আর তাতে উঠলুম না।

আস্তে আস্তে পথ ছেড়ে মাঠের মধ্যে হাঁটতে লাগলাম। লাল কাঁকর মেশানো জমি, সজনে আর মহুয়া গাছ এদিক ওদিক ছড়ানো। নির্জনতা এখানে গগনস্পর্শী। কাছেই একটা খুব ছোট পাহাড়, পাহাড় নয়, টিলা কিংবা টিবিও বলা যায়—আমি সেটার দিকে এগিয়ে গেলাম।

মনের ভেতরটা বিষম ভারী, বিষণ্ণতা আর অভিমান চাপ বেঁধে আছে! সেই নির্জন প্রান্তরে একাকী দাঁড়িয়ে মনে হল যেন সারা জীবনটাই বঞ্চিত হয়ে গেছি! অথচ কি জন্য ? বাসের মধ্যে চারটি ঝকঝকে মেয়ে আমার সঙ্গে কথা না বলে আর দুজনের সঙ্গে কথা বলেছে, সেই জন্য ? অসম্ভব অবাস্তব এই বিষণ্ণতা—সামান্য একটা জিনিসও না পেলে—সারা জীবনের সমস্ত না পাওয়া দুঃখ এসে ভিড় করে।

টিলাটার পাথরগুলো খাড়া এবং মসৃণ—একটাও গাছ বা লতা নেই। কিন্তু খাঁজ রয়েছে অনেক, বেশী উঁচুও নয়। একবার সামান্য পা পিছলে ধাক্কা খেতেই ধারালো পাথরের খোঁচায় কনুই-এর কাছে জামাটা ছিঁড়ে গেল। ইস্, নতুন জামা। আর একটা দুঃখ বাড়ালো। যুক্তিসংগত ভাবে পর্যাপ্তভাবে আজ আমার মন খারাপ করার সময়।

কিন্তু টিলাটার ওপরে যখন উঠে দাঁড়ালাম, সব বদলে গেল। বুকের মধ্যে এক ধরনের নিঃসঙ্গতা আছে। কিন্তু প্রাকৃতিক নিঃসঙ্গতা এত বিশাল যে তার রূপ অন্য রকম। টিলার ওপর দাঁড়িয়ে বহুদূর পর্যন্ত দেখা যায়, সাঁওতাল পরগণার আকাশ ও প্রান্তর। দূরের গ্রামে দু' চারটি ফুটকি ফুটকি আলো—এছাড়া পাতলা জল মেশানো ছাই রঙে ভরে গেছে দশদিক। টিলার ওপর আমি একা দাঁড়িয়ে—

কিন্তু একটুও নিঃসঙ্গ মনে হলো না। মনে হলো এই পাহাড় এই আকাশ ও ভূবিস্তার—এই বুনো ঝিঁঝির ডাক ও হাওয়ার খেলা—এ সবই যেন আমার। আমি এদের সম্পূর্ণ ভাবে ভোগ করতে পারি। আমি জীবনে অনেক খেলায় হেরে গেছি—কিন্তু আমি একটা পাহাড় জয় করেছি। এই পাহাড় চূড়ায় আমার পতাকা উড়িয়ে দিতে হবে। পকেটে একটা রুমাল পর্যন্ত নেই, আমি তখন আমার নীল-সাদা ডোরাকাটা জামাটা খুলে পতাকার মতন উড়িয়ে আপন মনে বলেছিলাম, এই পৃথিবীতে বেঁচে থাকাটা বড় মধুর। যে যাই বলুক, নানান দুঃখ কষ্ট মিলিয়ে বড় আনন্দেই বেঁচে আছি। হে সময়, আমাকে আর একটু সময় দাও।

কুড়ি

শিলচর থেকে লামডিং পর্যন্ত, এরকম খারাপ ট্রেন লাইন ভারতবর্ষে আর কোথাও আছে কিনা সন্দেহ। ছোট ট্রেন, অনিয়মিত চলাচল, কামরাগুলো যেমন নোংরা তেমনি অস্বাস্থ্যকর, আর ভিড়ের কথা না বলাই ভালো। ঝাঁসি থেকে কানপুর আসার সময় প্রায় এই রকম দুঃসহ ট্রেন যাত্রার অভিজ্ঞতা আমার একবার হয়েছিল, কিন্তু আসামের ট্রেনের অবস্থা আরও খারাপ।

তবে, শিলচর থেকে লামডিং পর্যন্ত এমন অপূর্ব সুন্দর পথ আর কোথাও আছে কিনা সন্দেহ। সমতলভূমি ছাড়িয়ে পাহাড়ের রেঞ্জে এসে ঢোকার পর ট্রেনের কামরা থেকে একবার বাইরে তাকালে আর চোখ ফেরাতে ইচ্ছে করে না। দু'পাশে কি আদিম অন্ধকার বন, মনে হয়, ঐ সব পাহাড়ী জঙ্গলে কোনদিন কোন মানুষের পায়ের ছাপ পড়েনি, সভ্যতার জন্মের আগে থেকে ঐ সব জঙ্গলে অন্ধকার বাসা বেঁধে আছে। দুর্দান্ত সরল স্বাস্থ্যবান পাহাড়ী নদী, নামও

তার কি রকম, ঝটিংগা! বেশ আস্তে আস্তে চলে ট্রেন, অসংখ্য ঝর্ণার ওপর ব্রিজ, মাঝে মাঝে ছোট্ট ছোট্ট স্টেশন। নিরভিরমান ছিমছাম স্টেশন, পাহাড়ের গায় খাপ খাইয়ে নিয়েছে, একটি বা দুটি লোক ওঠে নামে। স্টেশনের নাম এই রকম হারাংগাজাও। এইসব শব্দ শুনলেই বুকের মধ্যে রোমাঞ্চ হয়।

আমরা পাঁচ বন্ধু মিলে হাফলং যাচ্ছিলাম! ট্রেনের কামরায় এত ভিড় যে বসবার জায়গা তো দূরের কথা, ভালো করে দাঁড়াতেও পারছি না সোজা হয়। সব জায়গায় মালপত্র ঠাসা, তারই মধ্যে শিশু, বৃদ্ধ, অসুস্থ নারী, এমন কি দুজন খুনী আসামী পর্যন্ত—পুলিশ তাদের হাত-কড়া দিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। যাত্রীরাও যে কত জাতের—বাঙালী, অসমীয়া, পাঞ্জাবী, মাড়োয়ারী, মাদ্রাজী আর আঠারো রকম পাহাড়ী জাত। দরজার কাছে মেঝেতে মালপত্র পেতে তার ওপর বসে আছে পাঁচটি খাসিয়া যুবতী, গাঢ়—উজ্জ্বল রঙের স্কার্ট পরা, হাতে চওড়া ব্যাণ্ডের ঘড়ি, চোখে সান গ্লাস—দেখলে ভারতীয় বলে মনেই হয় না, অনেকটা স্প্যানীশদের মতন লাগে।

আসামে ট্রেনে চাপলে একবার না একবার নিজের দেশের কথা মনে হবেই? এত রকমের চেহারা, এত রকমের জাত ও ভাষা অথচ সবাই এক দেশের মানুষ, এটা অবিশ্বাস্য মনে হয়। একথাও মনে হয়, এদের সবাইকে কে এক করে মেলাবে? মেলাবার কোন মুলমন্ত্র কি সত্যি আছে? রেলের কামরায় প্রায় কেউই কারুর সঙ্গে কথা বলে না—কারুর সঙ্গে কারুর মিল নেই। বিশেষত পাহাড়ের মানুষরা সমতলভূমির মানুষদের বিশ্বাস করে না। কারণও আছে তার। তার একটা প্রমাণ আমি নিজেই দেখলাম।

আসামের প্রায় সর্বত্র রাইফেল হাতে মিলিটারির আনাগোনা। এমন কি ট্রেনের জানলা দিয়ে তাকালে মাঝে মাঝে চোখ পড়ে, দারুণ নির্জন পাহাড়ী জঙ্গলে ঝর্ণার ওপর কোনো সেতুর পাশে

সাব-মেশিনগান হাতে একজন সৈনিক দাঁড়িয়ে পাহারা দিচ্ছে। স্যাবোটাজের ভয়। ঐ সৈনিকটির জন্য মায়া হয়, ওর মতন নিঃসঙ্গ আর কি কেউ আছে ?

ট্রেনের কামরাগুলোতেও মিলিটারির অভাব নেই। তাদের জন্য আলাদা রিজার্ভড কম্পার্টমেণ্ট তো রয়েছেই, সাধারণ যাত্রী-কামরাতেও তাদের আনাগোনা। রাইফেল কাঁধে একজন বিশাল চেহারার পাঞ্জাবী সৈনিক আমাদের কামরায় ঘুরছিল, হঠাৎ সে আমাদের সামনের একটি পাহাড়ী যুবককে এসে বললো, তোমার মালপত্র কোথায় ? খুলে দেখাও !

আমরা দাঁড়িয়েছিলাম, যুবকটি বসবার জায়গা পেয়েছিল। ছিপছিপে চেহারার সুদর্শন তরুণ, বয়েস তেইশ-চব্বিশ, সে নাগা কি লুসাই কি খাসিয়া কি কাছাড়ী তা চেনার ক্ষমতা আমার নেই। তার হাবভাব ইওরোপীয় ধরনের, তার পোশাক, গায়ের রং আর শরীরের গড়ন দেখলে ভারতীয়ের বদলে স্প্যানীশ বা কোনো ল্যাটিন জাত বলেই মনে হয়, শুধু হয়ত নাকের উচ্চতায় একটু তারতম্য হবে।

যুবকটি বললো, তার সঙ্গে একটি সুটকেশ ও বেডিং আছে। কিন্তু অনেক মালপত্তরের নীচে চাপা পড়া, এখন বার করা মুস্কিল। কথাটা মর্মে মর্মে যে সত্যি, তা আমরাও বুঝতে পারছিলাম। অত ভিড়ে সব মালপত্র একেবারে লণ্ডভণ্ড হয়ে আছে, হঠাৎ কিছু একটা বার করা সত্যিই দারুণ ঝঞ্ঝাটের ব্যাপার।

সৈনিকটি তবু কঠোর ভাবে বললো, না, খুলে দেখাও।

যুবকটি তখন পকেট থেকে তার পরিচয় পত্র বার করলো। সে কি একটি সরকারি চাকরি করে—এটা দেখেও আশা করি তাকে ছেড়ে দেওয়া হবে।

সৈনিকটি বললো, ওসব জানি না, মালপত্র খুলে দেখাও।

—আমি যে-স্টেশনে নামবো সেখানে প্ল্যাটফর্মে যদি খুলে দেখাই তা হলে হবে ?

—না, এক্ষুনি দেখাতে হবে।

যুবকটির মুখে তখন রাগ, ঘৃণা না অভিমান—কিংবা তিনটেই মেশানো। কিন্তু সে ধৈর্য হারালো না। অতি কষ্টে সে তার স্যুটকেস ও বেডিং টেনে বার করলো, খুললো। আমরাও উঁকি মেরে দেখলাম, তার স্যুটকেসে নিছক প্যান্ট-সার্ট থরে থরে সাজানো, এছাড়া একটি অর্ধ-সমাপ্ত মদের বোতল ও একটি বাইবেল। নিষিদ্ধ কিংবা ভয়াবহ কিছুই নেই। তবু সৈনিকটি ছাড়লো না, তার বেডিংও খোলালো, সেখানে শুধু বিছানা। সৈনিকটি তখন চলে গেল অন্যদিকে।

ব্যাপারটা আমাদের সবারই খারাপ লেগেছিল। আমি যুবকটিকে জিজ্ঞেস করলাম, হঠাৎ আপনার বাক্স বিছানা খুলতে বললো কেন?

সে কোন উত্তর না দিয়ে অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে বসে রইলো। তার ঠোঁটে একটা তেজী অবজ্ঞার ভঙ্গি। সে আমাদের আত্মীয় মনে করে না।

তবু আমার কৌতূহল গেল না! আমি তখন ভিড় ঠেলেঠুলে পাঞ্জাবি সৈনিকটির কাছে গিয়ে নিরীহ গলায় জিজ্ঞেস করলাম, আচ্ছা, আপনি ঐ লোকটির বাক্স-বিছানা খুলে দেখাতে বললেন কেন?

আশ্চর্যের ব্যাপার, সৈনিকটি যা উত্তর দিল, তাও খুব অযৌক্তিক নয়। সে বললো, বুঝতেই তো পারছো, সামরিক দিক থেকে আসামের গুরুত্ব কতখানি! কেউ কোনো বন্দুক-পিস্তল বা এক্সপ্লোসিভ নিয়ে যাচ্ছে কিনা, সেটা চেক করতে হয়।

—আর কারুকে না করে শুধু ঐ ছেলেটিকেই বললে কেন?

—ট্রেনের সমস্ত যাত্রীর সমস্ত মালপত্র তো আর সার্চ করা সম্ভব নয়। তাই বেছে বেছে হঠাৎ এক একজনকে বলতে হয়—যাতে অন্যরাও ভয় পেয়ে যায়।

—কিন্তু ঐ পাহাড়ী ছেলেটিকেই শুধু বললে কেন? আমাকেও তো বলতে পারতে!

তারও কারণ আছে। বিদ্রোহী নাগা আর মিজোদের মতন অন্য কোনো পাহাড়ী জাতও হঠাৎ হয়তো হঠকারীভাবে সশস্ত্র বিদ্রোহ শুরু করতে পারে। সেইজন্য আমাদের সব সময় চেক করতে হয়।

সৈনিকটির যুক্তির সারবত্তা আছে। কিন্তু ঐ পাহাড়ী ছেলেটির দিক থেকে? সে নির্দোষ। সে ভাবলো, তার নিজের দেশে তার ইচ্ছে মতন চলা-ফেরার স্বাধীনতা নেই। অথচ অন্য প্রদেশের লোকেদের আছে। একজন বাঙালী বা মাদ্রাজী আসামে যেমন খুশী ঘুরে বেড়াতে পারে, কিন্তু আসামের আদি অধিবাসী হয়েও তাকে পুলিশের হাতে হয়রান হতে হবে। ঐ পাঞ্জাবী সৈনিকটি —যার সঙ্গে তার চেহারায়, ব্যবহারে, ভূষায় কোনো মিল নেই— তাকে সে কখনো নিজের দেশবাসী এবং বন্ধু বলে মনে করতে পারবে—এরপর?

যাক গে, আসামের সমস্যা নিয়ে মাথা ঘামাবো, সারবান মাথা আমার নয়। ও নিয়ে দিল্লীর লোকেরা মাথা ঘামাক।

হাফলং-এ গিয়ে পৌঁছলাম আমরা। ছবির মতন সুন্দর জায়গা, ভারী নির্জন। কলকাতার মানুষ কলকাতা ছেড়ে বেশীদিন কোথাও থাকতে পারে না—তবু দু'-একটা জায়গায় গেলে মনে হয়, এখানে সারা জীবন থেকে গেলে মন্দ হয় না! নিছক মনে হওয়াই যদিও। হাফলং সেই রকম জায়গা।

তবে, হাফলং-এর স্থানীয় অধিবাসিরা ভ্রমণার্থীদের সঙ্গে মেশে না। দূরে দূরে পাহাড়ে গরীব পার্বত্য-জাতিদের গ্রাম, শহরের লোকেরা সবাই প্রায় খৃষ্টান, ইংরেজি পোশাক ও ভাষা, ইওরোপীয় ধরনের জীবনযাত্রা। তাদের সঙ্গে যেচে কথা বলতে গেলে, তারা ভদ্র আড়ষ্টতায় দু'একটা উত্তর দেয়, তারপর এড়িয়ে যায়। কারুর

সঙ্গে বন্ধুত্ব হয় না। প্রায়ই মনে হয়, বিদেশের কোনো শহরে এসেছি। দু'-চারটে বাঙালীর দোকান আছে অবশ্য, তবে সে রকম দোকান তো বিলেতেও আছে।

এক বিকেলে আমরা বন্ধুরা বেড়াতে বেড়াতে একটু দূরে চলে গেছি। হঠাৎ বৃষ্টি এলো। বৃষ্টি মানে কি, সে এক সাংঘাতিক ব্যাপার, বৃষ্টির বদলে আকাশের জলপ্রপাত বললেও হয়। দিক দিগন্ত ভাসিয়ে দিচ্ছে বৃষ্টিতে।

কোথাও দাঁড়াবার জায়গা নেই. একটা বন্ধ দোকান ঘরের সামনে আমরা আশ্রয় নিয়েছি, তবু বৃষ্টির ছাঁট আমাদের ভিজিয়ে দিচ্ছে। আধ ঘণ্টা এক ঘণ্টা কেটে গেল, তবু বৃষ্টির সেই সমান তোড়। এভাবে আর দাঁড়িয়ে থাকা যায় না।

অনেকক্ষণ বাদে, দূরে বৃষ্টির মধ্যে রঙিন ছাতা মাথায় দিয়ে একটি মেয়ে আসছে। কাছে আসতে দেখলাম, একটি যুবতী পাহাড়ী মেয়ে, স্কার্ট পরা, রূপসী-যোগ্য অহংকারী মুখ-ভঙ্গি। সে আমাদের দিকে একবারও তাকালো না, আমাদের পাশ দিয়ে বেঁকে গেল একটা রাস্তায়, বোঝা যায়, কাছেই তার বাড়ি।

আমাদের এক বন্ধু বেপরোয়া হয়ে সেই বৃষ্টির মধ্যে ছুটে গিয়ে মেয়েটিকে ইংরেজিতে বললো, ছাখো, আমরা একদম ভিজে যাচ্ছি, তোমাদের বাড়িতে একটু বসতে দেবে?

মেয়েটি প্রথমে কথাটা বুঝতে না পেরে ভুরু কুঁচকে বললো, কি? তারপর আবার শুনে বললো, ইয়েস অফকোর্স!

নিছক বিলিতি ভদ্রতা। কোনো আন্তরিকতা নেই, বিখ্যাত ভারতীয় আতিথ্যের কোনো ব্যাপার নেই। আমরা ছুটতে ছুটতে মেয়েটির সঙ্গে তাদের বাড়ির বারান্দায় উঠলাম। একজন বৃদ্ধ লোক কঠোর মুখ নিয়ে বেরিয়ে এলো, মেয়েটি তাকে নিজেদের ভাষায় কি বলে চলে গেল বাড়ির মধ্যে। বৃদ্ধটি আমাদের রীতিমত জেরা করলো কিছুক্ষণ, তারপর বারান্দায় বসবার অনুমতি দিয়ে ভেতরে চলে গেল।

বারান্দায় একটা কাঠের বেঞ্চ পাতা। সেখানেও বসে স্বস্তি নেই, রীতিমত জলের ঝাপটা লাগছে। যদিও তখন মে মাস, বেশ শীত করতে শুরু করেছে। উঁকি দিয়ে দেখলাম, বারান্দার পরেই ওদের ড্রয়িংরুম, সেখানে রীতিমত সোফা-কৌচ পাতা, যীশুখৃষ্টের মূর্তি। পুরো বাড়িটাই বিলিতি ধরনের। আমাদের চেহারা খুব একটা হাড-হাভাতের মত নয়—তবু আমাদের ভেতরে বসতে দেওয়া হলো না।

খানিকটা বাদে একটি যুবক এলো বাড়ির ভেতর থেকে, আবার আর এক প্রস্থ জেরা। বৃষ্টি তখন আরও বেড়ে উঠেছে।

শেষ পর্যন্ত আমাদের ভেতরের ঘরে বসতে দেওয়া হলো বটে, কিন্তু কোনো আন্তরিকতা নেই। চা-ফা খাওয়ানো তো দূরের কথা। আমরা মনে মনে বলতে লাগলুম, আমরা কোনো দোষ করিনি, আমাদের পূর্ব-পুরুষরা যত দোষ করেছে, তার জন্য আমরা ক্ষমা চাইছি, আমাদের বন্ধু হিসেবে নাও।

কিছুই হলো না, ওরা আমাদের বিশ্বাস করে না।

একুশ

কিরকমভাবে তালা খুলতে হয়? তালা খোলার মাত্র দু'রকম স্বাভাবিক উপায় আছে। বন্ধ তালার সামনে দাঁড়িয়ে পকেট থেকে নির্দিষ্ট চাবি বার করে টুক করে খুলে ফেলা। অথবা যদি চাবি হারিয়ে যায়, তবে ছোট তালা হলে ডান হাতের মুঠোয় তালাটাকে চেপে ধরে—কব্জিতে সমস্ত জোর এনে কট্ করে ভেঙে ফেলা উচিত। আর, তালাটা যদি বেশ বড় হয়, একটা লোহার রড তালাটার মধ্যে ঢুকিয়ে মটাং করে ভেঙে ফেলা যায়। তালা খোলার এই দুই রীতি।

কিন্তু, অনেক মানুষ দেখেছি যারা এরকম সহজ পথে যেতে চায়

না। ঘন ঘন তালার চাবি হারিয়ে ফেলে বড় বেশী ব্যস্ত আর উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে পড়ে। তালাটাকে ভাঙার কথা মনেও পড়ে না। আশেপাশের বাড়ির সকলের কাছ থেকে চাবির থোকা নিয়ে আসে। হয়তো, জড়ো হলো পঞ্চাশটা চাবি, প্রত্যেকটা পরের চাবি এক এক করে চেষ্টা করা হচ্ছে নিজের তালায়। এতে কখনো তালা খোলে, আমার বিশ্বাস হয় না। তবে শুনেছি, কারুর কারুর ক্ষেত্রে খুলে যায়। কেউ কেউ আরও উৎকট কাণ্ড শুরু করে দেয়। তালার ছোট গর্তের মধ্যে একটা ছোটো পেরেক কিংবা লোহার তার ঢুকিয়ে খুব কায়দায় নাড়াচাড়া শুরু করে। এতেও নাকি তালা খোলা সম্ভব!

ছেলেবেলা, বিশ্বনাথ নামে একটি ছেলের কথা শুনতাম—যে নাকি চাবি হারানো তালায় পেরেক ঢুকিয়ে অনায়াসে খুলতে পারতো। সে ছিল পরোপকারী ছেলে, কারুর বাড়িতে এরকম তালা-সঙ্কট হলে ডাক পড়তো বিশ্বনাথের।

একদিন ওকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, সত্যিই তুমি পেরেক ঢুকিয়ে তালা খুলতে পারো?

—হুঁ! লাজুক হেসে বিশ্বনাথ বলেছিল।

—যে-কোনো তালা?

—হুঁ।

তখন আমি ব্যগ্রভাবে প্রশ্ন করি, সে তালাগুলো পরে আবার লাগানো যায়? ঠিক ঠাক থাকে?

—নাঃ! তা আর যায় না। খারাপ হয়ে যায়।

—আশ্চর্য! যদি খারাপই হয়ে যায় তবে তুমি অত কষ্ট করে খুলতে যাও কেন? ভেঙে ফেললেই তো হয়। সেটাই তো সোজা!

—কি করবো, সবাই যে খোলাতেই চায়। কেউ ভাঙতে চায় না! দেখবেন সকলের বাড়িতে দু চারটে তালা থাকে—যেগুলো দেখতে ঠিকই আছে, কিন্তু ভেতরের কলকব্জা খারাপ! তা ছাড়া, আমারও প্রত্যেকবারই মনে হয়, এবার বোধহয় না-খারাপ করেই খুলতে

পারবো।

এ জীবনে কার না দু' একবার তালার চাবি হারিয়েছে? চাবির মতো সামান্য জিনিস কখনো কখনো হারাতে বাধ্য। চেনা-শুনোদের মধ্যে, যারা ব্রাহ্মণ—তাদের দেখেছি, পৈতের সঙ্গে চাবি বেঁধে রাখে সযত্নে। তাদেরও চাবি হারায়। অতি সাবধানীদের বার বার হারায়।

আমার একটা অদ্ভুত স্বভাব আছে, যখন কোনো নতুন নারী-পুরুষের সঙ্গে পরিচয় হয়, মনে মনে আমি যখন তাদের চরিত্র ও স্বভাবের পরিমাপ করি, তখন প্রথমেই ভাবি, এঁর যদি কখনো চাবি হারিয়ে যায়, কি উপায়ে খোলার চেষ্টা করবেন? ভেঙে ফেলা, পাশের বাড়ি থেকে চাবির থোকা চেয়ে আনা, না বিশ্বনাথের মতো কারুকে ডেকে পেরেক নাড়াচাড়ার কৌশল জানতে আমার খুবই ইচ্ছে হয়। অথচ, মুখ ফুটে জিজ্ঞেস করতে পারি না। প্রথম পরিচয়ে অনেক কিছু জিজ্ঞেস করা যায়—কোথায় চাকরি, অমুকের সঙ্গে চেনা আছে কিনা! বাড়ির সামনের রাস্তায় জল দাঁড়ায় কিনা, প্রেসিডেণ্ট জনসনের বুদ্ধি সম্পর্কে তাঁর কি মত, সর্ষের তেল পাওয়া গেলেও আর বাদাম তেলের অভ্যেস ছাড়া উচিত না অনুচিত—এ সবই জিজ্ঞেস করতে পারি—কিন্তু সবচেয়ে জরুরী প্রশ্নটা কিছুতে জিজ্ঞেস করতে পারি না—চাবি হারিয়ে গেলে আপনি কি করেন? অথচ এ প্রশ্নের উত্তর জানা না হলে, একটা লোকের চরিত্র সম্পর্কে আমার কিছুই জানা হয় না, সব সময় আমি বিষম অস্বস্তি বোধ করি।

চাবি খোলার চরিত্র দেখে মানুষ চিনতে আমার ভুল হয় না। বিশ্বনাথের ছোট বেলা থেকেই আমার দুশ্চিন্তা ছিল। ওর পরোপকারী সরল মুখ দেখে আমার ভয় হতো, বুঝতে পারতুম বিশ্বনাথ ভুল করছে। আর আমার ছোটমাসী? আমাদের আত্মীয়-স্বজনের মধ্যে তিনিই প্রথম এম-এ পাশ মেয়ে। যেমন তীক্ষ্ণ বুদ্ধি, তেমন খুসীর হৈ-হল্লা করতে ভালোবাসতেন ছেলেবেলায়, অর্থাৎ আমার ছেলেবেলায়,—উনি তখন কলেজে পড়েন। ছোটমাসীর একটা চামড়ার সুটকেশ ছিল—

তার মধ্যে যে কি অমূল্য সম্পদ থাকতো জানি না। কিন্তু, প্রায়ই সে স্যুটকেশের তালার চাবি হারাতো। আমি দাদা মশাইর বাড়িতে যেতাম মাঝে মাঝে—গিয়েই শুনতুম, ছোটমাসী চাবি হারিয়ে বাড়ি মাথায় করেছেন। জামা-কাপড় ছড়িয়ে বইপত্র এলোমেলো করে ছোটমাসী চাবি খুঁজছেন। সে চাবি যে পাওয়া যাবে না সকলেই জানে—কোনদিন পাওয়া যায়নি। আমাকে দেখলেই বলতেন ছোটমাসী, এই নীলু, চট্ করে তালাটা ভেঙে দে' তো।—ছোটো টিপ-তালা, ভাঙতে এমন কিছু শারীরিক শক্তি লাগে না। এমন অনেকবার ভাঙতে এমন অনেকবার ভেঙেছি। প্রায়ই ছোটমাসী বাড়ি ফেরার পথে নতুন তালা চাবি কিনে আনতেন। একদিন আমি ঐ রকম সময়ে উপস্থিত হয়েছি। ছোটমাসী সাজগোজ করে কোথায় বেরুবেন, হঠাৎ চাবি খুঁজে পাচ্ছেন না। যথারীতি, আমার ওপর ভাঙার হুকুম হলো। আমি তালাটা হাতে নিয়ে, ছোটমাসীর মুখের দিকে তাকিয়ে বললুম, প্রায়ই যখন হারায়, তখন তুমি তালা লাগাও কেন?

ছোট মাসী মুখ ভেংচে বললেন, ইস্, বাক্স খোলা রাখি আর কি!

সেই মুহূর্তে ছোটমাসীর মুখের দিকে তাকিয়ে আমার মনে হয়েছিল, ছোটমাসী জীবনে সুখী হবেন না। কেন মনে হয়েছিল জানি না, কিন্তু ওঁর মুখের দিকে তাকিয়ে আমার ভয় হয়েছিল। তালা ভাঙার পর বাক্স খুলে ভেতরে কি আছে কোনদিন আমাকে দেখতে দেননি। কিন্তু, তখন আমি প্যাণ্ডোরার বাক্সের গল্প নতুন পড়েছি। আমার মনে হয়েছিল, বাক্স বন্ধ করে যা উনি আটকে রাখতে চাইছেন, তার নাম প্যাণ্ডোরার সেই 'আশা'। দুঃখ-দুর্দশা-কষ্ট-হতাশা আগেই বাক্স থেকে বেরিয়ে এসে ওঁকে ঘিরে ধরেছে। তখন ওঁর মুখ কিন্তু বিষম হাসি-খুসি থাকতো।

ছোটমাসীর জীবন সুখের হয়নি। ওঁর স্বামী স্বনামধন্য পুরুষ, নিউ আলিপুরে প্রাসাদোপম বাড়ি, দেবশিশুর মতো দুটি ছেলেমেয়ে, নতুন মোটরগাড়ি। তবু ছোটমাসীকে দেখলে না ভেবে পারি না।

উনি জীবনে সুখ পাননি।

ছোটমাসীর এক ছেলেকে দেখতুম, প্রায়ই গলির মোড়ে দাঁড়িয়ে থাকতে। তারপর জিজ্ঞেস করতুম, কি রে পরেশ. দাঁড়িয়ে আছিস কেন? পরেশ বলতো, চাবিওলা খুঁজছি।

ঝন ঝন শব্দ পুরোনো চাবিওলা কলকাতার রাস্তা দিয়ে যেতো—বাবা প্রায়ই চাবি হারিয়ে ফেলতেন, আশেপাশের সব বাড়ির চাবি লাগিয়ে চেষ্টা করার পরও না খুললে, পরেশ দাঁড়িয়ে থাকতো রাস্তায়। ডুপ্লিকেট চাবি বানাবে চাবিওলা ডেকে। অসিম ধৈর্য ছিল পরেশের—দাঁড়িয়েই থাকতো। আমরা তখন হয়তো ক্যারাম খেলছি কিংবা টেনিসবলের গলি-ক্রিকেট, পরেশ তবু দাঁড়িয়ে।· বলতুম, যা না, তালাটা ভেঙে ফেল! পরেশ যেতো না। চাবিওলা সঙ্গে নিয়ে বাড়ি ফিরতো।

জানতুম পরেশ জীবনে উন্নতি করবে। করেছে। ওর বাবার অর্ডার সাপ্লাইয়ের ব্যবসায়ে পরেশ আজ মেরুদণ্ড। লক্ষ লক্ষ টাকার খেলা করে। পাড়ার দুর্গাপূজোয় চাঁদা দেয় পাঁচশো টাকা, ঠাকুমার নামে হাসপাতালে দান করেছে এক লক্ষ। ব্যাঙ্কের লকারের চাবি পরেশ নিশ্চিত হারায় না।

আর, পেরেকের কৌশল জানা বিশ্বনাথ, একটা প্রাইমারি স্কুলে পড়ায়। হঠাৎ বেরিবেরিতে ওর একটা চোখ অন্ধ হয়ে গেছে, অন্য চোখেও কম দেখে। হাতে চাবি থাকলেও বিশ্বনাথ আজকাল তালা খুলতে পারে না—চোখে দেখে না বলে, চাবিটা গর্তে ঢোকাতে পারে না।

কিন্তু এ পর্যন্ত লিখে মনে হয় হয়তো আমার ভুল হচ্ছে। হয়তো, এসব যোগাযোগ কার্য-কারণহীন। মনে পড়লো, অনেকের চাবির রিঙে অনেকগুলো চাবি থাকে—কিন্তু সব চাবির তালা থাকে না। মেয়েদের আঁচলে যতগুলো চাবি বাঁধা থাকে —সবই তালা খোলার জন্য নয়। অনেক মেয়ের নাকি তালা খোলার দরকারই নেই—এমনিই আঁচলে

বা কোমরে চাবির থোকা ঝোলানো নতুন কায়দা। অনেক ছেলেও যে হাতে চাবির রিং ঘোরাতে ঘোরাতে যায়—সেসব কিসের চাবি? আমি বিভ্রান্ত হয়ে পড়ছি।

কিন্তু, আর একটি ছেলের কথা না বললে চলবেই না। তার তালা খোলার স্বভাব দেখে আমি শিউরে উঠেছি। ঘরের দরজায় তালা বন্ধ, সে চাবি হারিয়েছে। সে তালা ভাঙলো না, পাশের বাড়ি থেকে চাবির গোছা চাইলো না, পেরেক ঘোরালো না। বারান্দায় একটা স্ক্রু-ড্রাইভার ছিল, সে তাই দিয়ে দরজার যে কড়া দুটোর সঙ্গে তালা লাগানো—সেটাই খুলতে লাগলো। আমি বললুম, এ কি করছো, এ তো তালা খোলা নয়, ঘর ভাঙা!

সে বললো কিছুই ভাঙছি না। শুধু ঘরে ঢুকছি। দরজার কড়া দুটো পরে আবার লাগিয়ে দিলেই হবে।

আমি বললুম, তালাটা তো তখনও লেগেই থাকবে। পরে ত ভাঙতেই হবে।

—সে পরে দেখা যাবে। এখন তো ঘরে ঢোকা যাক্।

তালা না ভেঙেও বন্ধ ঘরে ঢোকার যে এরকম উপায় তার মনে এলো, তা দেখে আমি হতবুদ্ধি হয়ে যাই। ছেলেটির চরিত্র বা ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আমি কিছুই বুঝে উঠতে পারি না।